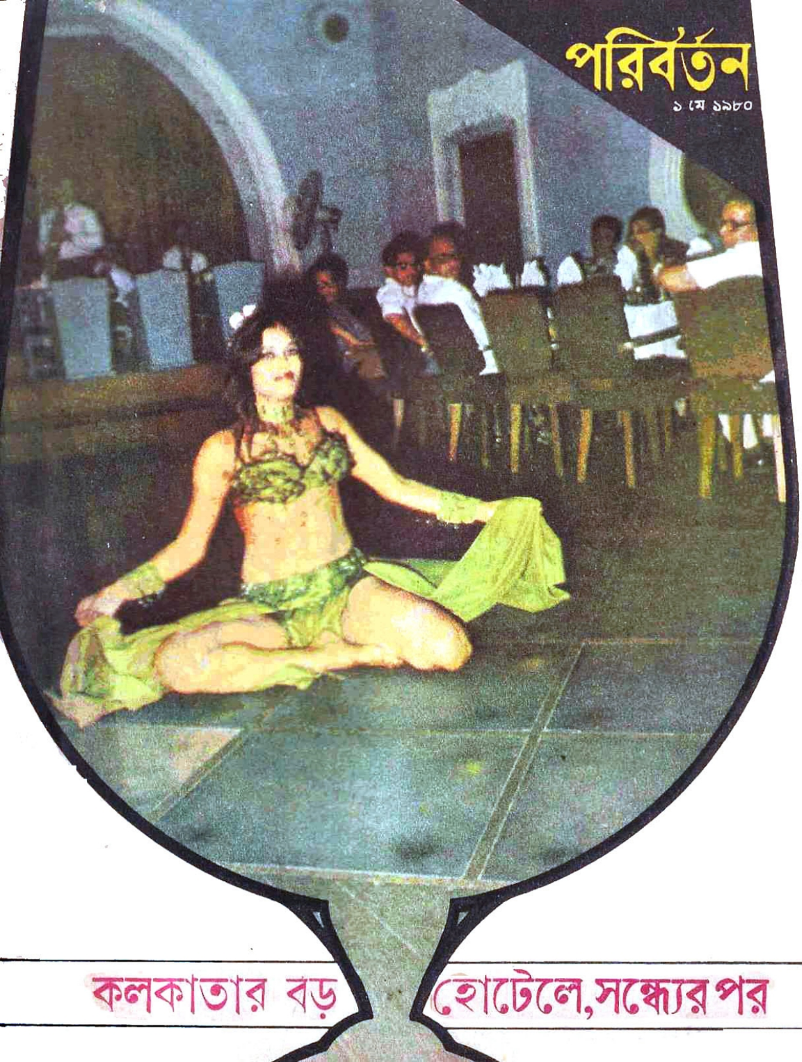
পরিবর্তন

১ মে ১৯৮০



কলকাতার বড় হোটেলে, সন্ধ্যের পর



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী : রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস
১৫
তিনি হীরে জহরতের ব্যবসা করতেন। তাই একটা মহামূল্য রত্নের খবর তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি ওটা পাওয়ার জন্য দারুণভাবে চেষ্টা করছিলেন। তাই না ?
আমি জানি না।
মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করো না।
বিশ্বাস করুন আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।
তুমি শপথ করে বলতে পার ?
আপনি যদি তাতে সন্তুষ্ট হন তাহলে তাই বলছি। আমি কিছু জানি না।
'বিশ্বের রত্ন'টি খুবই ছোট। কিন্তু মহামূল্যবান। আর সেই জিনিসটি আমার কাছেই আছে।
বাবা ওটা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলেই কি আপনি তাঁকে মেরে ফেলেছেন ?
ঠিক তাই। তবে তুমি আমার দলে যোগ দিলে এ শত্রুতার শেষ হবে।
তোমার দলে যোগ দেব ? জলদস্যুর জীবন ? না কখনো না।
আমাদের অবজ্ঞা করছ ? জান, 'টেরর' জাহাজে আমার কথা কেউ না শুনলে আমি তাকে ক্ষমা করি না।
জানি। তোমার যা খুশি তুমি তা করতে পার।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

চলতি বছরে চৈত্র মাসেই আলুর দর পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় কিলো প্রতি দেড় টাকায় উঠেছিল। ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সাধারণত বর্ষার শেষে আলুর দাম ঐ পর্যায়ে পৌঁছায়। ওয়াকিবহাল মহল বলছেন--বিদেশে রফতানির ফলেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অসময়ে আলুর জন্য এত পয়সা গুণতে হচ্ছে।

দেশের পণ্য বিদেশে পাঠিয়ে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা ঘরে আনতে হবে—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই মূল সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কিছু নেই। কিন্তু রফতানি তালিকায় ক্রমশ ভালো চাল, আলু, পিঁয়াজ, আম, পাকা কলা বা মাছের মত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও যুক্ত হতে দেখে শংকা জাগে। এমন তো নয় যে এসব জিনিস এ দেশে অঢেল : মানুষ খেয়ে কুল করতে পারছে না। আসলে বিদেশ থেকে পয়সা আনার লোভে দেশের নীতি নিয়ামকরা ভারতের অনেক সেরা খাদ্যসামগ্রীই নির্বিচারে বিদেশের বাজারে পাঠাবার ঢালাও অনুমতি দিচ্ছেন। তার ফল ভুগতে হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকেই। বিদেশী বাজারের টানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গত এক দশক ধরে চিংড়ি মাছ কী বস্তু তা ভুলতে বসেছে। আস্তে আস্তে টান পড়েছে পাকা ফলে, এখন যুক্ত হচ্ছে আনাজ-তরকারিও।

এর ফলে কিন্তু নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্য তালিকায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। পুষ্টিকর ফল-মূল, মাছ-মাংস, আনাজ, ভালো চাল-গম—কোন কিছুই তার কাছে আজ আর সহজলভ্য নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে—যে সব বস্তু উদরে পুরে সাধারণ বাঙালী আজ ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে তার পুষ্টি মূল্য কতটা ? দিনের পর দিন পুষ্টিবিহীন খবার আধপেটা খেয়ে জাতি হিসাবে আমরা কোথায় এগিয়ে চলেছি ?

প্রশ্নটা কিন্তু শুধু বাঙালীর নয়, সকল সাধারণ ভারতীয়েরই। গত বছর বাণিজ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আরিফ বেগ রাজ্যসভায় জানিয়ে ছিলেন—১৯৭৮-৭৯ সালে বিদেশে তাজা এবং বরফে জমানো মাংস রফতানি করে ভারত প্রায় ১৮ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। খুবই সুখের কথা। ভারতের মত দরিদ্র দেশের নানা রকম উন্নয়ন কর্মে বিদেশী মুদ্রা খুবই দরকারী। কিন্তু কিসের বিনিময়ে তা অর্জন করা হল ? দেশের মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে নয় কি ? সাম্প্রতিক খবর : খোদ রাজধানী দিললিতে মাংসের কিলো ১৮।২০ টাকায় উঠেছে। প্রশাসন ১২ টাকা কিলো দর বেঁধে দিয়েছেন ; কিন্তু সে দামে মাংস কোন বাজারেই পাওয়া যায় না। যোগান না থাকলে দাম বাড়বেই। নির্বিচার রফতানি যে অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তুলছে তাতে সন্দেহ কী ! একই চিত্র পশ্চিমবঙ্গেও। সাধারণ বাঙালীর ঘরে মাংস এখন নেহাৎ শৌখিন খাদ্য : দুর্লভ মাছও। পুষ্টি আসবে কোথা থেকে ?

তার্কিক হয়ত বলবেন—দেশের উন্নতির জন্যেই বিদেশে খাদ্যবস্তু রফতানি করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—কোটি কোটি অখাদ্য খাওয়া আর আধপেট খাওয়া মানুষের কাছে সে উন্নয়নের প্রকৃত মূল্য কতটুকু ?

পরিবর্তন

১ মে ১৯৮০
দ্বিতীয় বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা

প্রতি সংখ্যা ১.৫০
বিমান মাশুল :
পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা,
ভারতের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা



সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

এই সংখ্যায়



প্রচ্ছদপরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ • প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : অমিয় তরফদার

সমীপেষু

বিজ্ঞান চর্চা

দেবাশিস বিশ্বাসের 'আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার এত দরিদ্র দশা কেন' পড়লাম। এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখছি।

আমাদের দেশে অনেকেই গবেষণা করে চাকুরি জুটছে না বলেই স্কলারশিপ নেয় তাতে সিরিয়াসনেস নেই। বহু ছাত্রকে জানি ভালো চাকরি পেলেই রিসার্চ ছেড়ে দেয়। অথচ প্রকৃত আগ্রহী বহু ক্ষেত্রেই রিসার্চ করার সুযোগ পায় না—যথাযোগ্য উমেদারী করার অভ্যাস না থাকায়। মনে রাখতে হবে—পরীক্ষায় ক্লাস বা স্থান বিবেচনা করে প্রকৃত আগ্রহী ছাত্র নির্বাচন করা যায় না—বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে নাইনথ পেপার বলে একটা টার্ম পরিচিত আছে।

গাইডরা প্রশাসন কর্মে এবং ক্ষমতালাভের লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকে। অধিকাংশ গাইডের গভীরতর জ্ঞানের অভাব।

বিভিন্ন গাইড গবেষকদের মধ্যে কো-অরডিনেশনের থেকে শত্রুতাই প্রবল। এক গবেষকের ছাত্রদের সঙ্গে অন্য গবেষকদের ছাত্রদের রেষারেষিও চলে।

বিদেশে স্কলার পাঠানো এবং উন্নত বিজ্ঞান গবেষণায় ট্রেনিং-এর জন্যে যে সব চুক্তি আছে তার সুযোগ ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের প্রিয়পাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তিরাই স্কলারশিপ পায় চাটুকারিতার সাহায্যে।

টাকা পয়সা ফেরৎ যায়, বা লালফিতের মাহাত্ম্যে, রেষারেষিতে বা শত্রুতায়। অথচ গবেষণাগারে আধুনিক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য থাকে না।

'পেপার' করার জন্যে বহু ডেটা বা রিপোর্ট গোঁজামিল দেওয়া হয়; নিজস্ব প্রভাবিত জারনালে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় ফলস ডেটার উপর নির্ভরশীল পরবর্তীকালের গবেষণাও হয় ভ্রান্ত এবং গোঁজামিলযুক্ত ফলস ডেটা দিয়ে ডকটরেট প্রাপ্তির নমুনাও অপ্রতুল নয়।

গবেষকদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির হলেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা। ওদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ ডিগ্রি পাবার পর আর পুরানো ল্যাবরেটারিতে ফিরে যান না। অথচ হয়তো ওদের কাজের উপর ভালো পেপার বের হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রিসার্চ করা কালীন গাইডের দুর্ব্যবহারের স্মৃতি ওদের আর রিসার্চ করতে উৎসাহ দেয় না। পুনরায় রিসার্চ করার ইচ্ছা দেখালে অনেকেই মন্তব্য করে—উচ্চতর চাকরির সুযোগ সন্ধান করছে। গাইডও আর পূর্বের মত রিসার্চ কাজে নজর দেয় না, এমন কি ল্যাবরেটারির বেয়ারাও নয়। গবেষক অশান্তি ভোগ করেন। তাছাড়া রিসার্চের খরচ বহন করবে কে এ নিয়ে সমস্যা থেকে যায়।

যারা পোসট-ডকটরেট রিসার্চ করতে চায় তাদের জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত ল্যাবরেটারিরও একান্ত অভাব।

ফ্যাকালটি ইমপ্রুভমেনট স্কীমে যে সব অধ্যাপক রিসার্চ করেন পুরো বেতন পেয়ে তা ছাত্র পড়ানো থেকে অব্যাহতি পাবার একটা সুযোগ মাত্র আর যেনতেন প্রকারে একটা থিসিস খাড়া করার ইচ্ছা। তাতে উন্নত গবেষণা হওয়া অসম্ভব।

C.S.I.R., U.G.C. বা বিভিন্ন প্রদেশ সরকার যে সব স্কলারশিপ দেয় মাঝে মাঝে উচ্চতর গবেষণা করার জন্যে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গতানুগতিক রিসার্চ কাজেই ব্যয় হয় বা পরিমাণ এতই অল্প যে বই এবং সামান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় করতেই ফুরিয়ে যায়।

বিজ্ঞান চর্চা প্রচারের প্রধান বাধা হিসাবে দায়ী করা যেতে পারে নামী নামী পত্রিকার সম্পাদকদের এবং পাঠ্য পুস্তকের সিলেবাস রচয়িতাদের। যারা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ফিকশন লেখে তাদের একমাত্র আশ্রয় পরিচিতদের লিটিল ম্যাগাজিন। বড় পত্রিকার সম্পাদকদের আনুকূল্য পাবার মত সুযোগ সুবিধা অনেকেরই নেই।

বাংলা বই-এর পাঠক পাঠিকার রুচি মানসিকতারও পরিবর্তন দরকার। বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে নিচু থেকেই ছোট ছেলেদের পাঠ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ্য হিসাবে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।

ডঃ অমলেন্দু হাজরা, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৬৩

গানের স্কুল

অর্জুন পাঠকের 'গানের স্কুল নিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে' (পরিবর্তন ১৬ ফেব্রুয়ারি) পড়ে আমার প্রতিক্রিয়ার কথা জানাচ্ছি। লেখক বঙ্গীয় সংগীত জগতের এক দুরবস্থার জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। গান-বাজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবাঞ্ছিত এবং অস্বাস্থ্যকর ব্যবসা শুরু হয়েছে। এর কারণ চাহিদা। অধিকাংশ বাঙালী আজ আর গানবাজনাকে বাঈজী খ্যামটাদের ব্যাপার বলে মনে করে না: রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের গান আজ বাঙালীর মরমে প্রবেশ করেছে তাই লোকে গানবাজনা জানা পাত্রী পছন্দ করছে। বাধ্য হয়ে মেয়ের বাবাদের গানবাজনার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। রেডিওর কল্যাণে গানবাজনা এমন জনপ্রিয় হয়েছে যে, ইদানিং অনেক ছেলেমেয়ে গীটার, সেতার, তবলা, গান শেখার জন্য গানবাজনা জানা লোকদের কাছে ধর্না দিচ্ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগ্য শিক্ষকের যোগান কোথায়? চিরন্তন চাহিদা যোগানের নিয়মে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মত গানবাজনার স্কুল গড়ে উঠছে সংগীত ব্যবসায়ী লোকদের উদ্যোগে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল 'প্রভাকর বিশারদ, সুধাকর, গুণাকরের ছড়াছড়ি।' টিউটোরিয়াল হোম তার ছাত্র-ছাত্রীদের যত বেশি সংখ্যায় পাশ করাতে পারবে, ততই তার ব্যবসা ভাল চলবে: গানের স্কুলও তার ছাত্রছাত্রী যত বেশি সংখ্যায় প্রবীণ, ভাস্কর, রত্নাকর, প্রবর বাঁ রত্ন প্রসব করবে তার ব্যবসাও তত রমরমিয়ে চলবে। এই তো স্বাভাবিক।

তবে লেখকের মত আমি অতটা নৈরাশ্য-বাদী নই। কিছু স্কুল নিশ্চয় সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করে ছেলেমেয়েদের তৈরি করছেন। কিন্তু সেরকম স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ সংগীত বিদ্যালয় প্রভাকর, বিভাকর, রত্নাকর উপাধির লোভ দেখিয়ে মুনাফা লুটছে। এদের সংযত করা দরকার। গানের নামে প্রহসন আর কত চলবে? তাত্ত্বিক পরীক্ষার নামে ব্যাপক টোকাটুকি লজ্জাকর। শিক্ষার্থী কমে যাবার ভয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেখে না দেখার ভান করেন। অনেক জায়গায় আবার সংগীত শিক্ষক নিজে বই খুলে পরীক্ষার্থীকে সাহায্য করছেন তাও নিজের চোখে দেখেছি। প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী একই বছরে রবীন্দ্র, নজরুল, রাগ সংগীত এবং কত্থক নাচের পরীক্ষা দিচ্ছে। সংগীত সাধনার ব্যাপারটা কি রকম ছেলেমানুষীর পর্যায়ে নেমে এসেছে দেখুন। একটি সংগীত বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিতে এসে পরীক্ষক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাশ করানোর বিনিময়ে মাথা পিছু ৫০ টাকা করে দাবি করলেন। শিক্ষকের বক্তব্য, সামান্য ফি-এ পরীক্ষা নেওয়া যায় না। উপাধি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কি এসব দুর্নীতির ব্যাপার জানেন না, নাকি জেনেও না জানার ভান করছেন? প্রয়াগ সংগীত সমিতি কিংবা প্রাচীন কলাকেন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গঠিত হয়নি। তাহলে ওরা কয়েক লক্ষ টাকার জন্য কেন এসব অনাচারে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? প্রয়াগ সংগীত সমিতির সিলেবাস হিন্দিতে। বাংলা থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। বাংলায় সিলেবাস করা যায় না? পরীক্ষার ফরমে যে বাংলা দেওয়া আছে তাকি কোন বাংলা জানা লোককে দিয়ে সংশোধন করে নেওয়া যায় না? এত অবজ্ঞা বা অবহেলা কেন?

অর্জুন পাঠক মশায় কতকগুলো সুপারিশ করেছেন। আমি কয়েকটা করতে চাই।

১। ভারতীয় সংগীতবিদ্যাবিহার, বঙ্গীয় সংগীত পরিষদ, সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের পরিবর্তে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সংগীত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হোক। এর হাতে থাকবে সিলেবাস রচনা পরীক্ষা পরিচালনা ও উপাধি প্রদানের দায়িত্ব! এই সংগঠন সংগীতের বিভিন্ন শাখায় প্রতিশ্রুতিবান শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবেন, সংগীত বিষয়ে গবেষণার কাজ চালাবেন, সংগীত বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করবেন।

২) শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উপযুক্ততা বিচার করে সংগীত বিদ্যালয় অনুমোদনের নিয়ম প্রবর্তন করা হোক।

৩) ব্যবহারিক পরীক্ষার শিক্ষকদের যোগ্যতা কঠোরভাবে বিচার করে তবে তাদের পরীক্ষক নিযুক্ত করা হোক। শিক্ষকদের পরীক্ষা গ্রহণ ফি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ান হোক, নইলে উপযুক্ত পরীক্ষক পাওয়া যাবে না।

৪) তাত্ত্বিক পরীক্ষা ঠিক মত নেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শক পাঠান প্রয়োজন।

৫) একই বিষয়ে একই দিনে সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রয়াগ সংগীত সমিতির পরীক্ষায় দেখেছি, একই বিষয়ে একই বর্ষের পরীক্ষা বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দিনে হয়। এতে প্রশ্ন জানাজানি হয়ে যায়।

৬) স্কুলগুলো যথাযথ ভাবে শিক্ষা দিচ্ছে কিনা তা দেখার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে গুণী ব্যক্তির অভাব নেই। সংগীতের বিভিন্ন শাখায় খ্যাতিমানরা একত্রিত হয়ে কি একটা কেন্দ্রীয় সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন না? সরকারকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভালো। তবে প্রারম্ভিক ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারী সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ কদাপি নয়।

রামচন্দ্র ধাড়া, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা

॥ ২ ॥

'গানের স্কুল নিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চলেছে' লেখাটি পড়লাম। লেখক যদি একজন সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় ও অসাধারণ জ্ঞানী সংগীত-গুণীর নামোল্লেখ না করা সত্ত্বেও লেখক কাকে 'মীন' করছেন তা আমরা বুঝতে পারছি। প্রতি অযথা মিথ্যা ও অশালীন ইংগিত এবং কটুক্তিগুলি না করতেন তাহলে হয়ত কতকাংশে লেখাটি মন্দ হত না। কিন্তু উপরোক্ত আচরণে লেখকের আসল উদ্দেশ্যটি ফাঁস হয়ে গেছে—যেন ঐ সাধু চরিত্র শ্রদ্ধেয় সংগীতজ্ঞের প্রতি কোন ব্যক্তিগত আক্রোশই উক্ত রচনাটির উৎস; বাকিটা 'ছেঁদো কথা'। লেখক তার ঐ জঘন্য মিথ্যা উক্তিগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন কি?

সুব্রত সেনগুপ্ত, কলকাতা ৭০০০০৮

নির্মলেন্দু

১৬ মার্চ 'পরিবর্তনে' সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে নির্মলেন্দু চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার পড়লাম। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি লোক-সংগীত সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। লোকসঙ্গীতের আধুনিক সমস্যা নিয়ে আমি 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা—বাংলা ও আসাম' নামে একটি বই লিখেছি। তাতে বিস্তারিত আলোচনাও করেছি।

এই সাক্ষাৎকারের শুধু একটি বিষয়েই আমার কিছু বলার আছে। সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু বলছেন: জানেন কি, 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বেশির ভাগ গানে আমি সুর করেছি, যদিও সবসময় তা স্বীকার করা হয় না।' নির্মল আমার অতি স্নেহের পাত্র। ওর গণনাট্য সংঘে প্রবেশ ও সঙ্গীত পরিবেশন শুরু হয় আমার হাত দিয়েই। আমার প্রথম দিককার গানের তিনি প্রধান প্রচারক ছিলেন শুধু তাই নয়, সেইসময় আমি অনেক গান তার সঙ্গে বসে রচনা করেছি। সত্যিকথা বলতে কি, সেইসব লৌকিক সুর আমারও নয়, তারও নয়। প্রচলিত লোকসঙ্গীতের সুরে আমি শুধু আন্দোলনের ভাষা বসিয়ে দিয়েছি। তথাপি, আমার প্রথমদিককার গানে যে নতুন ঢং ছিল, তাতে নির্মলেরও অবদান আছে। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত আমার প্রথম গানের বই 'বিষাণের' ভূমিকায় আমি সেইকথা স্বীকার করেছি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমি যে গান লিখেছি, তখন আমি আসামে গণনাট্য আন্দোলন গড়ার

কাজে ব্যস্ত। তাই সিলেট ছাড়ার পর তার সঙ্গে আমার তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। তখন যে গানগুলির জন্য আমার জনপ্রিয়তা হয়েছিল, যেমন—'মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', সেই গানের কথা ও সুর আমার নিজস্ব।

ইদানীং আমার অনেক সৃষ্টিধর্মীগান জনপ্রিয় হয়েছে, যেমন 'শংখচিল'। তার খবরই হয়তো নির্মল রাখেন না। কাজেই আমার সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্যগুলি করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাতে আমি বেদনাহত। পিতাকে যদি পুত্র অস্বীকার করে, তবে পিতার বেদনা পাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। কিন্তু নির্মল চিরদিন এইরকম ছিলেন না। একসময় তিনি আমাকে গুরু বলে স্বীকার করতেন, সম্মান দিতেন। মহম্মদ আলী পার্কে তৃতীয় বার্ষিক বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে যে লৌকিক সুরনির্ভর নৃত্যনাট্যটি তিনি উপস্থিত করেছিলেন, সেই উপলক্ষে ২২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৬২ সাল, তারিখ চিহ্নিত পল্লীগাথা শিরোনামার পুস্তিকাটিতে নির্মল লিখেছিলেন—'এই সময়ে সংস্পর্শে এলাম আমাদের আধুনিককালের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন লোক সঙ্গীতের ধারা বহন করতে। লোকশিল্পের বিকৃত পরিবেশনায় আধুনিক কৌশল সম্পর্কে প্রথমেই তিনি আমাকে সতর্ক করে দেন এবং যথার্থরূপে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি আসামে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তুলছেন। আমার শিক্ষাগুরু শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের সহায়তা পেয়েছিলাম বলেই লোকশিল্পের সাধনায় আত্মনিয়োগ করার রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে আমি যোগদান করি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে।'

হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কলকাতা-৪৭

॥ ২ ॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু চৌধুরী বলেছেন 'জানেন কি, বড়লোকের বিটি লো কিংবা বলি ও ননদী কার লেখা ও সুর? আমার ছাত্র রামরতন কাঁইয়ার। দু'বছর আগে ও গান আমাকে সে দিয়ে গেছে।'

এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করছি। 'বলি ও ননদী আর দুমুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে' এই গানটির রচয়িতা বর্তমান পত্র লেখক বীরভূম জেলার হেতমপুর নিবাসী আশানন্দন চট্টরাজ। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আমার কাছে আছে। গানটির রচনা-তারিখ —৩০/৬/৬৮।

গানটি ১৯৭৬ সালে সিউড়ী থেকে প্রকাশিত লক্ষ্মী নারায়ণ দাস দালাল কর্তৃক সম্পাদিত 'কালো মেঘ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্পী শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্তীর প্রথম রেকর্ডে 'বলি ও ননদী' গানটির গীতিকার হিসাবে আমার নামই মুদ্রিত আছে।

আশানন্দন চট্টরাজ, হেতমপুর, বীরভূম

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনে বিদেশী ছাত্র বহিষ্কার বিষয়ে প্রতিবেদনটির জন্য ধন্যবাদ। একটা অমার্জনীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ ও তার স্বরূপ উদঘাটনের সত্যিই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। আরো কিছু তথ্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীর জানার প্রয়োজন আছে। দীর্ঘকাল আমি শান্তিনিকেতনবাসী। অদ্যাবধি কোন বিদেশী ছাত্র, গবেষককে আমি বিতাড়িত হতে দেখিনি। কোনদিনই বিশ্বভারতীর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল মহান ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত হতে দেখিনি।

আজ এখানকার সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র শিক্ষক, আশ্রমিকদের মনে একটি প্রশ্ন প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেন, একজন বিদেশী ছাত্রকে বিতাড়িত হতে হলো, কেন আমরা কালো চামড়ার বঙ্গসন্তান হিসাবে বিদেশী ছাত্রকে 'কালো কুকুর' বলে অভিহিত করে তার আত্মমর্যাদা ও সম্মানকে হেয় করে ক্ষিপ্ত করে তুললাম? আজ প্রতিটি আশ্রমিকের আন্তরিক দাবি—অবিলম্বে ভারত সরকার এই কলঙ্কিত বিষয় নিয়ে আনুপূর্বিক তদন্ত করুন। তদন্তের বিষয় হওয়া উচিত ১) যে ছাত্রের মার্জিত সরল ব্যবহার ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকরা এত ভালবাসতেন, যে ছাত্র মোহরদিকে (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) 'মা' সম্বোধন করতো—সে ছাত্র কেন সেই মোহরদির বাড়ির দরজা ভাঙতে গেল, অন্যান্য অধ্যাপকদের প্রহার করতে গেল—বিস্তৃত তদন্ত হওয়া দরকার।

২) অধ্যক্ষ নিমাইচাঁদ বড়াল বাদিয়ানকে দুর্গাপুরে গান করতে যেতে নিষেধ করেছিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে তার ডিগ্রি ডিপ্লোমা বন্ধ করে দেবার হুমকী দিয়েছিলেন? বৃত্তি হিসাবে টিউটোরিয়াল চলার কথা যে চরম অসত্য একথা এখানকার সবাই জানেন।—এরও তদন্ত প্রয়োজন।

৩) বিদেশী ছাত্রদের দেখাশোনার জন্য প্রচুর সুযোগ সুবিধা ও মোটা অংকের বেতনওয়ালা প্রোক্টর, ডীন অব স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, ফরেন স্টুডেন্টস এ্যাডভাইসার আছেন। তারা এই হতভাগ্য ছাত্রটির জন্য কি করেছিলেন তদন্ত হওয়া দরকার।

৪) এই ছাত্রটি বিতাড়িত হবার পর সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন না কেন তার তদন্ত চাই।

৫) বিদেশী ব্ল্যাকডগটির বান্ধবী (কল্পনা) টাকা পয়সা গোলড ও উপহার বেমালুম হজম করে এখনও বহাল তবিয়তে সতী সাবিত্রীর মতো হোসটেলেই অবস্থান করছেন। কল্পনা কি সীজার পত্নী?—বিস্তৃতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত করে এই মহান প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করুন।

সুধাময় সেন, শান্তিনিকেতন

অলচিকি

১ মার্চের পরিবর্তনে বিশেষ প্রতিনিধির লেখা 'সাঁওতালী' লিপি সমস্যা মিটেছে কি?—পড়ে মর্মাহত হলাম। আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধি মশাই এরকম লেখা যা ভেবে প্রকাশ করেছেন—তার মর্ম আমরা ভালই বুঝি পারি। অলচিকির বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা সাঁওতালই নয়। যদি তারা সাঁওতাল বলেই নিজেদের পরিচয় দেয় তাহলে জানবেন—তারা সাঁওতালী ভাষাই জানেন না। না হয় তারা সেই ধরনের ভদ্রলোক যাদের আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখেছি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ইংরেজের কাছে ধরিয়ে দিচ্ছে।

'এড়' বলে কোন অশ্লীল শব্দই সাঁওতালীতে নেই। 'ডায়াক্রিটিকাল মার্কস' বাংলাতে যথেষ্ট আছে; সেদিকে কেন কেউ নজর দেয় না? বাংলা লিপি কতদিনের? বাংলাতে লেখা পড়া কি লিপি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই চালু হয়েছে?

বিহার, উড়িষ্যাতে অলচিকির স্বীকৃতি সরকার দেবে কিনা সেটা আমরা বিহার-উড়িষ্যাবাসীরা জানি। আপনাদের এ নিয়ে অনাহুত বক্তৃতা সহ্য হয় না।

পণ্ডিত মুর্মু'কে নিয়ে কটাক্ষ করার বিরুদ্ধে আমি ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। লিপি যে কেউ সৃষ্টি করতে পারলে সাঁওতালরা এ দশায় থাকত না। বাংলায় তো চ—চল, থ—আকাশ হয়, তাহলে শব্দ কি একেলায় বর্ণ হচ্ছে না? সাঁওতালী লিপির দোষ ধরবার লোকতো অনেক। আপনাদের দোষ ধরলে কি রকম লাগে? বাংলাতে টাইপরাইটারের অসুবিধেগুলো ভেবে দেখবেন কি?

শিক্ষায় আমাদের ছেলেরা এগোবে না পিছোবে তা নিয়ে আপনারা কুম্ভীরাশ্রু দয়া করে ফেলবেন না।

জগদীশ টুডু, মোসাবনী মাইনস, সিংভূম, বিহার

কোটনীশ

পরলা মার্চের পরিবর্তনে 'কোটনিশ কমিটি কি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত? চীনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি?' শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। কোটনিশ কমিটি সংক্রান্ত লেখার জন্য লেখককে ধন্যবাদ। আমি কোটনিশ কমিটির রাজ্য কমিটির একজন নতুন সদস্য। তাই ঐ কমিটি সম্পর্কে কিছুটা খবর রাখি। ডাঃ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি যে রাজনীতির সঙ্গে অর্থাৎ বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় তা ঐ কমিটির সদস্যদের নামের উপর চোখ বোলালেই বোঝা যায়। লেখক সমাজসেবী মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রাজনীতি থাকতে পারে চিন্তা করলেন কি করে? যেহেতু আকুপাংচার চীনের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ডাঃ কোটনিশের স্মরণীয় দিনগুলি চীনে কেটেছে সুতরাং তার স্মৃতিরক্ষা কমিটি তো চীন-ভারত মৈত্রীর কথা বলবেই। কমিটিতে সব ধরনের মানুষ আছেন, তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার কথা কখনই বলেন না। এটা কমিটির পত্রিকা 'অঙ্কুর' পড়লেই সবাই বুঝবেন। গতবছর পাটুলী প্রভৃতি কমিটি সায়াটিকা, পলিও, পক্ষাঘাত, একজিমা প্রভৃতি রোগের একশো পাঁচশ জন রোগীর প্রায় অর্ধেককে সম্পূর্ণ ভাল করতে পেরেছেন। এই স্বল্পব্যয়ের 'আকু' চিকিৎসাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়, চুপী, বর্ধমান

কয়লা

১ মার্চ সংখ্যায় প্রফুল্লকুমার সিংহ মশাই কয়েকটি পরিসংখ্যান দিয়ে ই সি এল এর তাবৎ অফিসারদের হয়ে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন। অজয় বিশ্বাস ১ জানুয়ারি সংখ্যাতেই এদের মুখোশ বেশ ভাল ভাবেই খুলেছেন। তবু দু-একটা কথা বলার ইচ্ছে থেকে বিরত থাকতে পারলাম না। এরা একটা কথা কেন বোঝেন না যে কর্মীদের মাইনে দেওয়া হয় কাজ করার জন্য আর অফিসারদের মাইনে দেওয়া হয় কাজ করানোর জন্য। তাদের অধিকাংশেরই সে যোগ্যতা নেই। তাই এই দুরবস্থা। আর মালিকদের আমলে শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার তো ছিলেন এরাই—এই সব বর্তমান ই সি এল'র পদস্থ মাইনিং ইনজিনিয়াররা। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদের অসুবিধের পড়তে হবে এতো জানা কথা। সমস্ত অসুবিধে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা কি এরা পাননি?

সিংহ মশাই রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। কি বিরাট ধাপপাবাজি চলছে ই সি এল-এ তা কি আর কারো জানতে বাকি আছে? সামান্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরের শেষে বেশ কয়েক লক্ষ টন কয়লার কাগুজে অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই না থাকায় কোমপানিকে তা মুছে ফেলতে হয়েছিল। এই বিরাট পরিমাণ কয়লার উত্তোলনের সমস্ত খরচ বহন করার পর তার অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া মাইনিং ইনজিনিয়ারিং এর কোন পেপার-এ পড়ানো হয় সিংহ মশাই তা বলবেন কি?

দৈনিক এককোটি টাকা ক্ষতি প্রদানকারী সংস্থার অফিসারদের চালচলন কি বাদশাহের মত নয়?

সমস্যা একটাই, ই সি এল এ মাইনিং ইনজিনিয়ারদের সবজান্তা মনোভাব। তারাই সব বোঝেন আর সবাই বোকা। প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট হর্তাকর্তা এরাই। একের বিপদে অন্য জন এসে দাঁড়ান তাই এ দুর্নীতি চক্র ভাঙবে কি করে? দায়িত্বের সঙ্গে ক্ষমতার সমবন্টন না হলে কোন উন্নতিই হবে না, যতই 'Bulletin' বের করে প্রগতির চিত্র দেখানো হোক না কেন।

অজয় সরকার, রানীগঞ্জ

সূর্যগ্রহণ

সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত প্রবন্ধে অজয় বিশ্বাস 'গ্রহণের সময় খাওয়া নিষিদ্ধ' এই প্রচলিত প্রবাদটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন গ্রহণের সময় অতিবেগুনীর মত জীবাণুধ্বংসী রশ্মি পৃথিবীতে এসে না পৌঁছনোর ফলেই বাতাসে ভাসমান জীবাণুর দল সক্রিয় হয়ে মানুষের দেহে নানা রোগের সৃষ্টি করে।

গ্রহণের সময় সূর্য থেকে উৎসারিত অতিবেগুনী রশ্মি এসে পৌঁছয় না ঠিকই, কিন্তু প্রতি রাত্রেও তো সূর্য অস্ত যাবার পর সেই সব জীবাণুধ্বংসী রশ্মি সমূহের অভাব ঘটে। তখন কেন সেই সব জীবাণুর দল সক্রিয় হয়ে ওঠে না?

বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রগণ্য কোন দেশই কিন্তু এই গ্রহণের সময়ে খাওয়ায় কোন ক্ষতির আশংকা করে না। এবং তারা কোন জীবাণু ঘটিত রোগেরও শিকার হয়ে পড়ে না।

আসলে এটা আমাদের হাজারো অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম।

বিশ্বজিৎ দাস, বেলুড় মঠ, হাওড়া

এবার কুড়ি টাকার সাম্মানিক পাবেন ডঃ অমলেন্দু হাজরা।

অনিবার্য কারণে সাম্মানিকের টাকা পাঠাতে অনেক সময় মাস তিনেক লেগে যায়। অনুরোধ: অধৈর্য হবেন না।—সম্পাদক।

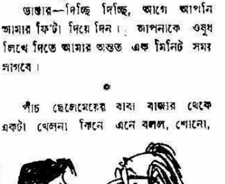


রুগী- ডাক্তার বাবু, আমার স্মরণশক্তি খুব দুর্বল। আমি মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ভুলে যাই,এমন ওষুধ দিন যাতে…

ডাক্তার—দিচ্ছি দিচ্ছি, আগে আপনি আমার ফি'টা দিয়ে দিন। আপনাকে ওষুধ লিখে দিতে আমার অন্তত এক মিনিট সময় লাগবে।

*

পাঁচ ছেলেমেয়ের বাবা বাজার থেকে একটা খেলনা কিনে এনে বলল, শোনো,



অম্লমধুর

তোমাদের মধ্যে যে মায়ের সব কথা শোনে, মায়ের মুখে মুখে তর্ক করে না, মাকে খুব সেবা যত্ন করে তাকেই এই সুন্দর খেলনাটা দেবো। বলো কে নেবে? তখন পাঁচ ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে বলে উঠল, তাহলে ড্যাডি এই খেলনাটা নিয়ে তুমি খেলা কর।

দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা লাইন পাবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও টেলিফোন অপারেটর-এর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ভদ্রলোক একটা গাঁদাফুলের মালা কিনে হাজির হলেন অপারেটর মহিলার ঘরে—

অপারেটর—কি ব্যাপার! এখানে কী চাই?

ভদ্রলোক—আপনি মরে গেছেন ভেবে ফুলের মালা নিয়ে এসেছিলাম।

*

ছেলে বাংলা ব্যাকরণ পড়ছিল। সামনের পাঁচিলে একজন একটা পোসটার সেঁটে দিয়ে গেল। পোসটারএর দিকে তাকিয়ে ছেলে জিজ্ঞেস করল 'বাবা ধর্মঘট-এর সমাস কী?'

'সমাস নয়, ওটা কমাস হবে সেটাই জানবার।' বাবার উত্তর।

*

দাম্পত্য জীবন নিয়ে আলোচনারত দুই বন্ধু—

প্রথম—আরে ধুস! আমার মুখের ওপর আমার বৌ কোনও কথাই বলতে পারে না। আমার কথাই শেষ কথা'—

দ্বিতীয়—উঃ! ভাবাই যায় না, বৌ তোর এত বাধ্য! তা কীরকম কথা তুই বলিস আমাকে একটু শিখিয়ে দেনা ভাই!

প্রথম—বৌ যা কিছুই বলুক না কেন, আমি বলি 'তুমি ঠিকই বলেছ'।

জীবন ভৌমিক

ভিখারি (জনৈক ভদ্রলোককে)—বাবা, দুটো পয়সা দেবেন। ভগবান আপনাকে লাখপতি করবেন।

ভদ্রলোক—তুই সরাসরি তাঁর কাছেই চা' না বাবা। আমায় আর মাঝখানে রাখছিস কেন?

শান্তিকুমার দাস

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

পারকের মৃত্যু দক্ষিণ কোরিয়ার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে

বল্মীক

জাপানের প্রধানমন্ত্রী মাসাযোশি ওহিরা বললেন, পারক ছিলেন দক্ষ নেতা। ফিলিপিনসের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মারকোস বললেন, তিনি নিজের দেশে স্থিতাবস্থা ও প্রগতি এনেছিলেন এবং এশিয়ায় শান্তিস্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। তাইওয়ান পারকের সম্মানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করল। প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে প্রিয় দক্ষিণ কোরিয়া বা কোরিয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এই পারক চুং হি-কে কিন্তু নেহাৎই একজন অধঃস্তন কর্মচারীর হাতে প্রাণ দিতে হল। দক্ষিণ কোরিয়ার ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, পুলিশের গোয়েন্দা ব্যবস্থা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কোরিয়া ভাষায় ছোসোন শব্দের অর্থ প্রত্যুষকালীন শান্তির দেশ। কোরিয়ার নাম আগে তাইই ছিল। সম্ভবত দারুণ সৌন্দর্যময় প্রকৃতির জন্যই এই নাম। চীনের ঠিক লাগোয়া দক্ষিণ প্রান্তিক এই ভূখণ্ডের ওপর বারবার বিদেশী হামলা হয়েছে। চীন, রুশী জার সাম্রাজ্য এবং জাপানী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়েছে দেশটি। উত্তর-পূর্বে একফালি জমির ওদিকেই রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা।

কোরিয়ার দক্ষিণে জাপান। পশ্চিমে পীত সাগর পূর্বে জাপান সাগর।

তিন তিনটি সাম্রাজ্য শাসন সত্ত্বেও চীনের প্রভাবই কোরিয়ার ওপর বেশি। এখানকার মূল ধর্ম বৌদ্ধ ও কনফুৎসিয়ানবাদ আসে চীনের পথ ধরেই। এখনও অধিকাংশ মানুষই হয় বৌদ্ধ না হয় কনফুৎসিয়পন্থী। এছাড়া স্থানীয় একটি ধর্মবিশ্বাস আছে, নাম ছোন-দোকাইয়ো। এর মানে স্বর্গপথের ধর্ম। এর অনুগামীর সংখ্যা সামান্য।

চীনের লিপি বহুদিন পর্যন্ত ছিল কোরিয়ারও নিজস্ব লিপি। কিন্তু রাজা সেজাং-এর আদেশে কোরিয় পণ্ডিতরা নতুন একটি লিপি প্রণয়ন করেন। তার নাম হানগুল। ১৪৪৬ সাল থেকে এটিই কোরিয়ায় চালাবার চেষ্টা হয়। কিন্তু বিশেষ চলেনি। পরে দুই কোরিয়াই বাধ্যতামূলকভাবে হানগুললিপি চালানোর আদেশ দেয়।

দুই কোরিয়া মানে উত্তর কোরিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে উত্তরাংশে এসে পৌঁছায় সোভিয়েত রেড আরমি। ঠিক সেই ভাবেই দক্ষিণাঞ্চল থেকে জাপানীদের তাড়ায় মার্কিন বাহিনী। ফলে একটিতে কমিউনিসটদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যটিতে অ-কমিউনিসটরা ক্ষমতায় বসেন পৃথক শাসন ব্যবস্থার দাবিতে কোরিয়া দু'টুকরো হয়ে যায়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অর্থনীতির গতি ছিল শ্লথ। শাসন ব্যবস্থাও ছিল নড়বড়ে। এরকম নড়বড়ে অবস্থায় ১৯৬১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পারক চুং হি ক্ষমতা দখল করেন। সে সময় ৫০ কোটি স্টারলিং-এর মত বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল এদেশের। কিন্তু গত বছর পর্যন্ত এই পরিমাণ তিনি টেনে এনেছিলেন ২০০ কোটিতে। সেই বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে আছে বস্ত্র, ইস্পাত, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কয়েকটি উৎপাদিত জিনিস।

এই অগ্রগতির মূলে পারকের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। তাই পারকের মৃত্যুতে কোরিয়ার প্রজাতন্ত্র এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব এলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই দক্ষিণ কোরিয়ায়। পারক ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই সেনা-বাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে আসছিলেন। এদেশের গোয়েন্দা বাহিনীর নাম কে সি আই এ। সহজেই বোঝা যায় মার্কিন সি আই এর অনুকরণে এর কাজকর্ম চলত।

প্রাচ্য দেশগুলিতে মার্কিন বন্ধুদের মধ্যে ইরানের শাহ যেমন ছিলেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকার অধিকারী, তেমনই ছিলেন এই পারক-ও। লক্ষ্য করার বিষয় এই দুজনেরই মূল অবলম্বন ছিল নিজস্ব গোয়েন্দাবাহিনী সাভাক এবং কে সি আই এ অর্থাৎ কোরিয়ান সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সি। কিন্তু সাভাক শেষ পর্যন্ত শাহর সঙ্গেই ছিল আর পারক চুং হি-কে হত্যা করলেন তার নিজেরই গোয়েন্দাকর্তা কিম জায়ে কিউ।

মার্কিন হোয়াইট হাউসের অনুকরণে পারকের সরকারি প্রাসাদের নাম ছিল ব্লু হাউস। ব্লু হাউস পারককে বিদায় জানিয়েছে একচোখে অবিশ্বাস ও একচোখে ভালবাসা নিয়ে

উত্তরের সঙ্গে সংযুক্তির একটা কথা ইদানীং উঠেছে দক্ষিণে। পারকের তাতে অমত ছিল না। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এই মনোভাবের মূলে কাজ করে থাকতে পারে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংযুক্তি হতে দিতে রাজি নয়। পারকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনাদের ছুটি বাতিল করে সীমান্তে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে অবশ্য স্টেট ডিপার্টমেনটের একজন মুখপাত্র বললেন, 'না উত্তর কোরিয়ায় কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। সেখানে সামরিক প্রস্তুতির কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি।'

দক্ষিণ কোরিয়ার মঞ্চ থেকে পারক তো বিদায় নিলেন আকস্মিকভাবে, তার হত্যাকারী কিম জায়ে কিউ-র প্রাণদণ্ডও হল। তারপর কি হবে?

নতুন রাষ্ট্রপতি যিনি হয়েছেন সেই চোই কিউ হা আগে ছিলেন অধ্যাপক। পারকই তাকে প্রশাসক পদে নিয়ে আসেন। কিন্তু এদেশের শক্তিশালী গোয়েন্দাবাহিনীর সঙ্গে তার কোনরকম সদ্ভাবই নেই।

ইনি ছাড়া দেশের রাজনৈতিক হাল ধরার মত আর দুই নেতা আছেন। দুজনেই ছিলেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতির বিশ্বস্ত। একজন ৫৩ বৎসর বয়স্ক কিম জং পিল। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে পিলের সম্পর্ক খুব গভীর। অন্যজন ৬১ বৎসর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী চুং ইল কোয়াং।

পারককে আকস্মিক ভাবে হত্যার পিছনে উদ্দেশ্য কি ছিল তা এখনও পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি। হতে পারে পেছনে আর একটি সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাই কাজ করছিল। কারণ কোরিয়ার সেনা-বাহিনীতে ইদানীং নতুন চিন্তাভাবনা দেখা দিচ্ছে। সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অফিসার শ্রেণী মনে করছেন দক্ষিণ কোরিয়ায় এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা দরকার। উত্তরের সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাব সম্ভবত এই চিন্তারই বাস্তু প্রয়াস।

মার্কিন সেনাবাহিনীর যারা দক্ষিণ কোরিয়ায় আছেন তাদের সঙ্গে স্বদেশী সেনাবাহিনীর অন্তর্সংঘাত প্রতিনিয়তই চলছে।

তাছাড়া গত ডিসেম্বরে দেশে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে পারকের নিজস্ব দল বিরোধী নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির কাছে গোহারান হেরেছে। বিরোধী নেতা কিম দায়ে জুং বহুদিন ধরে বন্দী। বন্দী অবস্থায় থেকেই এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'এখন রাষ্ট্রপতিকেও সোজাসুজি নির্বাচিত হতে হবে।'

দেশের অধিকাংশ মানুষই পারককে চাইছিলেন না। হয়ত তার এই নীরব বিদায়ও তাই খুব শোকাবহ নয়। ★



ত্রিপুরার ইট ভাটায় আদিমতার রাজত্ব চলছিল

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চদশ শতাব্দীর মতো ওদের হাতে পায়ে কোমরে শিকল ছিলো না, কিন্তু চাবুক হাতে সর্দার ছিলো, কড়া পাহারার বন্দীশালা ছিলো। যেখানে নারীপুরুষ প্রায় বিনামূল্যে শ্রম দিতে বাধ্য হতো—বাধ্য হতো একই ঘরে ভাইয়ের সামনে বোন, স্বামীর সামনে স্ত্রী, বাবার সামনে মেয়ে, ছেলের সামনে মা অপরের কাছে নিজের দেহকে ডালি দিতে। ওরা আজ মুক্তি পেয়েছে। ওদের মতো আরও কতজন ত্রিপুরা তথা সারা ভারতে এই ক্রীতদাসের জীবন ভোগ করছে কে তার হিসেব রাখে?

দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর, মেলাঘরের গোটা ছয়েক ইট ভাটার শ দুয়েক শ্রমিকের সেই ভয়ংকর জীবন—পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশ্বের কলঙ্কময় দিনগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনে দিয়েছে।

ওরা বিহারের রাঁচি জেলার লোক। কেউ মুণ্ডা, কেউ ওরাং বা তিনা। সবাই আদিবাসী। গতবছর আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে খরা-বন্যায় ওরা যখন ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত, সেই সময়ে দেবদূতের মতো সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল মদন সরদার, জগদীশ সরদার। ওরা কাজ দেবে বেনারসে, বারৌনিতে। দিনে ন'টাকা মজুরি। কাজের জায়গায় নিয়েও যাবে সরদারেরা। গ্রামের সরদারের সামনেই কথা পাকা হয়েছিল। মদন ও জগদীশ আসবার সময়ে পরিবারের অন্যদের হাতে ২০, ২৫ বা ৫০ টাকা দিয়ে এসেছিল। বাকি টাকা তো মানি অরডার করে আসছে: সুতরাং ভাবনা কি?

একদিন শুভক্ষণ দেখে ট্রাকে উঠে বসেছিল ওরা। নিজেরা কেউ-ই রাস্তা চেনে না তাই ওরা ট্রাকে করে চলে এলো শিলিগুড়ি। ওদের অজান্তেই এক সরদার সেখানে আর একজন সরদারের কাছে ওদের বেচে দিলো। এমনি কেনা-বেচা হতে হতে গৌহাটি-শিলচর আগরতলা হয়ে ওরা চলে এলো দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন ইট ভাটায়। তারপর শুরু হলো ওদের ক্রীতদাস জীবন।

ন'টাকা মজুরি? শুনে হা হা করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠেছিলেন এক ইট ভাটার ম্যানেজার। রোজ একটাকা বা দুটাকা পেত ওরা। তাতে একজন মানুষের একবেলার ভাতও জোটে না। সরদারেরা ওদের দেখাশোনা করে। দেখাশোনা মানে পাহারা দেয় যাতে কেউ পালিয়ে না যেতে পারে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে না। সপ্তাহে একদিন হাটবার। বিকেলে সরদারের পাহারায় লাইন বেঁধে বাজারে যায়, রেশন নেয়—মালিক আর সরদারের নির্দিষ্ট দোকান থেকে। তারপর আবার ফিরে আসতে হয়। শুধু তাই নয়, ওরা এক ইট ভাটা থেকে আর এক ইট ভাটায় বিক্রি হয়েছে কখনও গোষ্ঠীগতভাবে, কখনও বা পরিবারগতভাবে। ওদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্যই দেওয়া হয়নি।

ওরা দিনে চৌদ্দ-পনেরো, কখনও বা আঠারো ঘণ্টা খাটতো। ভোর তিনটে, সাড়ে তিনটে থেকে কাজ। কাজের শুরু ও শেষ,মালিক আর সরদারের মর্জির ওপরে। কাজ করবো না বললে চাবুক পড়বে পিঠে। কোন ওজর আপত্তি কিছুই শুনবে না সরদার। এমনকি অসুস্থতার অজুহাতও নয়। শিশুদেরও শ্রম নেওয়া হয়েছে অমানুষিকভাবে।

একটা করে ছোট খুপরী—আট/নয় জন করে থাকতো সেই খুপরীতে। আর যে খুপরীতে কুড়ি বছরের তরুণী অচ্ছি মুণ্ডা বা শান্তি তিনা কিংবা আঠারো বছরের ঠুনিয়া ওরাং থাকতো স্বামী অথবা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে, সে ঘরেই রাতের পর রাত এসে হাজির হতো দেহলোলুপ কামুক সরদার বা তার স্যাকরেদরা। তারা সারা রাত ধরে স্বামী, ভাই অথবা বাপের সামনেই ওদের যুবতী দেহের সব মধু নিংড়ে নিংড়ে শুষে খেতো।

এই তো সেদিন তরুণী মা জাসনী তিরকির একমাত্র শিশু সন্তানটা বিনা চিকিৎসায় মরলো। মরলো বিনা ওষুধে, বিনা খাদ্যে। মালিক ইট ভাটা এলাকা থেকে বেরুতে দিতো না, আর ভেতরে চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই। একটা নয়। এমনভাবে বিনা খাদ্যে, বিনা ওষুধে মায়ের কোলে মাথা রেখে মরেছে আরও কয়েকটা শিশু।

এমনিভাবেই চলছিল দিনগুলো। কিন্তু একদিন জীবনকে বাজি রেখে রাতের অন্ধকারে জনা দু-তিন শ্রমিক পালালো তাদের ব্যারাক ছেড়ে। অনেক ঘুরে, অনেক জায়গায় মাথা খুঁড়ে আবার ফিরে চললো নিজের গ্রামে। গ্রামের সরদার আর সরকারী 'বাবুদের' বললো তাদের অবস্থা। বিহার সরকার লিখে পাঠালেন ত্রিপুরা সরকারকে।

রাঁচির উপজাতি কল্যাণ কমিশনার কে বি সাকসেনার অনুরোধে ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস আর শংকরণের সযত্ন, মানবিক তদন্তে উন্মোচিত হলো মধ্যযুগীয় ক্রীতদাস প্রথার এক আধুনিক অধ্যায়,এক ভয়ংকর ইতিহাস। বিহারের ২০৯ জন আদিবাসী সেই নরকযন্ত্রণা থেকে নতুন জন্মলাভ করলো। এদের মধ্যে ৯টি শিশু এবং ১০৭ জন তরুণী। ত্রিপুরা সরকার ওদের প্রত্যেককে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়। সরকারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এ রাজ্যে (ত্রিপুরায়) এ-ঘটনা আগেও হয়েছে। প্রতিবাদী শ্রমিকের শিশুকে ইটের চুল্লীতে ছুঁড়ে দেওয়ার কাহিনী অনেকেরই জানা। বহিরাগত শ্রমিকদের উপর নানা অত্যাচারের কাহিনী বিধানসভাতেই কয়েকবছর আগে আলোচিত হয়েছে।'

শ্রীশংকরণ জানিয়েছেন ত্রিপুরায় মোট ৭১টি ইট ভাটা আছে। এর মধ্যে ৫৭টি রেজিসটারড। সারা রাজ্যে ৬৪০০ জন শ্রমিক—এর মধ্যে ৫০ শতাংশের ওপরই বিহারের লোক। এ ব্যাপারে আরও ব্যাপক তদন্ত করা হবে বলে তিনি জানান। আরো কত ভয়ংকর, কত বীভৎস ঘটনা উদ্ঘাটিত হবে কে জানে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ★

আমাদের বিচারকেরা কতটা নিরপেক্ষ ?

সুদীপ মজুমদার

কদিন আগে দিল্লীর ইনডিয়া ইনটারন্যাশনাল সেনটারে প্রায় শতখানেক বুদ্ধিজীবী জড় হয়েছিলেন। দেশের সামনে যে সমস্যার পাহাড় জমেছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। অনেকেই বক্তব্য রাখলেন। সোলি সোরাবজী এক সময় ছিলেন সলিসিটর জেনারেল। তিনি ছোট ভাষণ দেবার অনুমতি চাইলেন সভাপতির কাছে। অনুমতি দেওয়া হল।

সোরাবজী বললেন, আপনারা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি সে সম্পর্কেও একটু ভেবে দেখবেন। ভেবে দেখুন, কি ভাবে দেশের মানুষের মন থেকে কোর্ট-কাছারি আদালত, বিচারপতিদের প্রতি আস্থা উবে যাচ্ছে। আদালত আজকাল যে রকম আচরণ করছে তাতে সাধারণ মানুষের বিচার পাওয়ার সুযোগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক প্রবণতা।

সোরাবজী বললেন—কিছুদিনের মধ্যেই সুপ্রিম কোরটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন ছয় জন বিচারপতি নিযুক্ত করতে হবে। দুটি আসন খালি পড়ে আছে। চারজন বিচারপতি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবেন। যদি এখনই জনমত গড়ে তোলা না যায় তবে সরকার নিজের পছন্দ মত লোককেই বিচারপতির কাজ দিয়ে দেবেন।

সোলি সোরাবজী ভাষণ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হল ঘরের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি অনুভব করা গেল। এই অশান্তি সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ছে। 'দূর, আজকাল আর আদালত কি রায় দেবে? গভর্নমেনট আদালত আর বিচারপতিদের মুঠোয় করে রেখেছে'—এমন একটা মনোভাব ক্রমশই দানা বাঁধছে। বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের যে আস্থাটুকু ছিল তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই প্রবণতা যেমন একদিকে শঙ্কা আর অশান্তি নিয়ে এসেছে, অন্য দিকে তেমনি বিভিন্ন ফোরামে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। 'মথুরা রেপ কেস' ও বিচারপতি ভগবতীর ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা একটা চিঠি নিয়ে এই বিতর্ক শুরু হয়। তা আজও চলছে।

পি এন ভগবতী সুপ্রিম কোরটের কর্মরত বিচারপতি। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৮০ তারিখে ইন্দিরা গান্ধীকে (প্রধানমন্ত্রী হবার পর) একটা লম্বা চিঠি লেখেন। বিচারপতি ভগবতী হয়ত ভেবেছিলেন—সুপ্রিম কোরটের প্যাডের কাগজে লেখা চিঠিটা কোনও দিন বাইরের কারো চোখে পড়বে না। কিন্তু চিঠিটার কপি কিছু উকিলের হাতে পড়ে। শ্রীমতী গান্ধীর প্রশংসায় চিঠির গদগদ ভাষা আইনজীবী মহল, বার এ্যাসোসিয়েশন, এমন কি বিচারপতি মহলে একেবারে তুলকালাম বাধিয়ে দেয়। বিচারপতি ভগবতী তখন সুইজারল্যানডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। উনি ফিরে এসে এই বিতর্ক ও বাদ-বিবাদের ব্যাপারটা টের পান। সব কিছুর মূলে তাঁর লেখা ওই চিঠিটা। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য—সুপ্রিম কোরটের একজন বিচারপতি একজন রাজনৈতিক নেতাকে এমন 'চাটুকারিতা'র ভাষা ব্যবহার করে চিঠি লিখবেন—এ তো কল্পনাও করা যায় না। সুপ্রিম কোরট বা তার বিচারপতিরা তো তাদের 'স্বাধীনতা' বজায় রাখার জন্য 'রাজনৈতিক আচার-আচরণ' বর্জন করেই চলেন।

চিঠিটা শুরু ও শেষ হয় অনেকটা শ্রীমতী গান্ধীর স্তবগাথা দিয়ে। বাছা বাছা সব বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে শ্রীমতী গান্ধীকে ও তাঁর 'মহিমা'কে ব্যক্ত করতে। আর আছে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা—গরিবের বিচার পেতে কেন কষ্ট হয়, কি করে বিচার ব্যবস্থাকে শোধরানো যায় সে সম্পর্কে বিচারপতি ভগবতী কী করতে চান—এইসব কথা। তিনি শুধু চান প্রধানমন্ত্রীর স্নেহভরা আশ্বাস।

চিঠির কিছু অংশ দেখা যাক। শুরু হয়েছে এই ভাবে—"Dear Indiraji, May I offer you my heartiest congratulations on your resounding victory in the elections and your triumphant return as the Prime Minister of India. It is a most remarkable achievement of which you, your friends and well-wishers can be justly proud." এ যেন কোনও এক জেলা লেভেলের রাজনৈতিক নেতা নিজের অবস্থা সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রদেশ লেভেলের নেতার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে দরখাস্ত করছেন। "Your party has been voted to power with an amazing outburst, amounting to an avalanche of affection and enthusiasm and now the people are looking forward to an era where there will be for everyone freedom from want and destitution."

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইসতাহারের ভাষার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে না? সাধারণ মানুষ এসব কথা শুনে অভ্যস্ত, কিন্তু বিশ্বাস কেউই করে না।

এরপর সামাজিক বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য। বিচারপতি ভগবতী চিঠি শেষ করেন একেবারে পোয়েটিক উপমা আর রূপক ব্যবহার করে:

"Today the reddish glow of the rising sun is holding out the promise of a bright sunshine. May that sunshine fill our hearts with joy and bring comfort and cheer to the poor, half-naked, hungry millions of our countrymen. That is my only prayer to God on this occasion. With kind regards, yours sincerely, P. N. Bhagwati."

প্রাক-এমারজেনসি আমলে কলকাতার দেওয়াল-লিখন "এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী"র কথা মনে পড়ে যায় না চিঠির শেষটা পড়তে পড়তে? তবে বিচারপতি ভগবতীর চিঠিটা পড়ে বোঝা যায় না এই "rising sun" কে? শ্রীমতী গান্ধী না তার পুত্র সঞ্জয় গান্ধী?

বিচারপতি ভগবতীর চিঠি বিচারপতিদের মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে। তবে সবাই তেমন মুখ ফুটে কিছু বলেননি। কিন্তু ইনডিয়ান ল ইনসটিটিউটে এক ভাষণ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোরটের আর এক বিচারপতি ভি ডি তুলজাপুরকর তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেই ফেললেন। তিনি বলেন—যদি বিচারপতিরা কোনও রাজনৈতিক নেতার নির্বাচনী জয়ে উল্লসিত হয়ে তাকে ফুল বেলপাতা আর গদগদ ভাষায় লেখা চিঠি পাঠাতে শুরু করেন তবে সাধারণ মানুষের ন্যায়তন্ত্রের উপর বিশ্বাস উবে যাবেই। বিচারপতি তুলজাপুরকর যে তাঁরই সহকর্মী বিচারপতি ভগবতীর চিঠিকে মনে রেখে ও কথাগুলো বলছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি বলেন—আজ যদি এমনটা ঘটে তাহলে সেদিন দূরে নেই যখন বিচারপতিরা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতাদের পাশে ঘুরঘুর করতে শুরু করে দেবেন। সেদিন দেশের ও ন্যায়তন্ত্রের কাছে হবে সব চাইতে দুঃখজনক দিন।

সুপ্রিম কোরটের প্রায় ৫০ জন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এক মিটিংয়ে বিচারপতি ভগবতীর শ্রীমতী গান্ধীকে চিঠি লেখার নিদারুণ সমালোচনা করেছেন।

বহুদিন ধরেই আমাদের দেশে বিচারপতি

ও আদালতকে একেবারে ধোয়া তুলসিপাতার মত মনে করার একটা ধারা চলে আসছে। যে বিচার ব্যবস্থা আর আইন-কানুন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চালু করেছিল এ দেশের মানুষকে দাস করে রাখার জন্য তারই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আমাদের আজকের বিচার ব্যবস্থা আর বিচারকরা। তা সে সুপ্রিম কোরটই হোক বা কোনও মহকুমা শহরের কাছারিই হোক। একথা কাউকে বোঝানর দরকার নেই যে যার যত টাকা আছে সে সেই অনুপাতে বিচার পাবার ব্যবস্থা করতে পারে। যার কোনও অর্থ নেই তার জন্য শুধুই অবিচার বা বিচারের প্রহসন। তা সে যত নিরপরাধই হোক না কেন। তা না হলে বছরের পর বছর হাজার হাজার বিচারাধীন কয়েদীরা জেলখানার নারকীয় অবস্থার মধ্যে কেন দিন কাটাতে বাধ্য হন?

আদালত ও বিচারপতিরা যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ঊর্দ্ধে নন তার প্রমাণ আজ আর নগণ্য নয়। জনতা সরকার আসার পর যে সব আদালত বা বিচারপতি শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর অনুচরদের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি করছিলেন, আজ তারাই ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে টুপটাপ করে মামলাগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছেন বা দোষীদের খালাস করে দিচ্ছেন বিনা বাক্য-ব্যয়ে। বিভিন্ন মামলার দোষীরা রাতারাতি নির্দোষ সাব্যস্ত হচ্ছেন। প্রমাণ বা অপ্রমাণের দরকার নেই। সরকার যে বদলে গেছে!

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি ভগবতীর তিন বছর আগেকার একটি বিচার উল্লেখযোগ্য। তখন জনতা দল সবে ক্ষমতায় এসেছে। আর গোটাকতক রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর দলের নির্বাচনী পরাজয় সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এই বিচারপতি ভগবতীই বলেছিলেন—এটা একটা সাধারণ হার নয়, 'There has been a total rout of candidates belonging to the ruling party... Never in the history of this country has such a clear and unequivocal verdict been given by the people, never a more massive vote of no-confidence in the ruling party.'

বিচারপতি ভগবতীকে কয়েক বছর আগে একটা কমিটির নেতা বানিয়ে কি করে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করা যেতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে বলা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোরটও পেশ করা হয়ে গেছে সরকারের কাছে। সেই কমিটির পরামর্শ-গুলো উল্লেখ করে বিচারপতি ভগবতী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাড়াতাড়ি গরিবদের জন্য কিছু করতে। কিন্তু অতিরিক্ত আগ্রহে তিনি নিজের সহকর্মীদের এমনকি পুরো সুপ্রিম কোরটেরই সমালোচনা করে ফেলেছেন। বিচারাধীন মামলার বিশাল পাহাড়কে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'The position is almost desperate and yet there does not seem to be any sense of urgency in the court.' অনেকের প্রশ্ন—বিচারপতি ভগবতীর হৃদয় যদি গরিবের প্রতি অবিচারের জন্য ক্ষতবিক্ষতই হয়ে থাকে তবে তিনি সুপ্রিম কোরটের চাকরি কেন এখনও ধরে বসে আছেন? বিনা ব্যয়ে লিগাল এড (legal aid)-এর ব্যবস্থাইতো সর্ব প্রথমে করা দরকার।

বিচারপতি ভগবতী আজ সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছেন সম্ভবত ওই চিঠিটা বাইরে ফাঁস হয়ে যাবার দরুন। কিন্তু সুপ্রিম কোরটের অন্য কয়েকজন বিচারপতি (যখন জনতা সরকার কেন্দ্রে ছিল) একটা প্রস্তাব এনেছিলেন যে কোনও বিচারপতি যেন প্রকাশ্যে মদ্যপান না করেন। অনেকের ধারণা—এই ধরনের প্রস্তাব তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের 'মদ্যপানবিরোধিতা' সমর্থন করে রাজসিক অনুগ্রহ পাবার আশা নিয়েই করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়। কয়েকজন বিচারপতি চেয়েছিলেন বিচারকদের প্রকাশ্যে মদ্যপান করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হোক। আশ্চর্য ব্যাপার। যদি বিচারপতিদেরই আইন দিয়ে বাগে আনতে হয় তবে তারা কি করে আইনের মর্যাদা রক্ষা করবেন?

অবসর গ্রহণের পর কি হবে? সবার মত বিচারপতিরও তো এ ধরনের পার্থিব চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎটা তো লক্ষ রাখতে হবে। যদি বিদেশী রাষ্ট্রদূতের চাকরি একটা পাওয়া যায়। অথবা হওয়া যায় কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল। এসব চাকরিতে তো বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু চাকরি তো সরকারের হাতে। তাই খুশী রাখো তাদের যারা হাতে ক্ষমতা নিয়ে বসে আছে।

এমতাবস্থায় কি করে আশা করা যায় যে সরকার বা রাজনৈতিক নেতারা বিচার ব্যবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করবেন না? সুপ্রিম কোরটে ছটা পদ খালি হতে চলেছে। বিভিন্ন হাইকোরটে বিচারপতির ৫১টা পদ খালি আছে। এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে শীঘ্রই ৭২ হবে।

বর্তমান কংগ্রেসী সরকারই এই সব পদে চাকরি বিতরণ করবেন। ওদিকে আদালত-গুলির অবস্থা শোচনীয়। সুপ্রিম কোরটে প্রায় ১৯,০০০ কেস অমীমাংসিত হয়ে পড়ে আছে। বিভিন্ন হাইকোরটগুলিতে অমীমাংসিত মামলার সংখ্যা ৬,২৯,৭২২ (১৯৭৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত)। আর সেশন কোরট-গুলোর কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক।

আইন কমিশন ৭৯তম রিপোরট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন—বিচারপতিদের নিযুক্ত করার সময় যেন রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব না দেখান হয়। এছাড় আরও অনেক কয়টি পরামর্শ দিয়েছেন কমিশন।

এই প্রসঙ্গে 'মথুরা রেপ কেস' সংক্রান্ত বাদানুবাদে বিচারপতি উনটওয়ালিয়ার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর আগের কথা। মথুরা হরিজন মেয়ে- বয়স তার তখন ১৫। মহারাষ্ট্রের এক ছোট শহরে দুজন পুলিশ কনসটেবল তাকে জোর করে ধর্ষণ করে। সেখানে কোরট কনসটেবল দুজনকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মহারাষ্ট্র হাইকোরট দুই কনসটেবলকে আবার দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু মামলা যখন সুপ্রিম কোরটে আসে তখন তিন বিচারপতির এক বেনচ দুজন কনসটেবলকে আবার খালাস করে দেন এই বলে যে মথুরা যে যৌন সংগমে সম্মতি দেয়নি তার কোনও প্রমাণ আদালতের কাছে নেই। এই বিচার শোনার পর সারা দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলন ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লীতে বিভিন্ন নারী সংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, সুপ্রিম কোরটের রায়ের বিরোধিতা করে কোরটের সামনে ধরনাও দিয়েছেন। এর কিছু দিন পর 'মথুরা কেসের' আবার সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমীক্ষা করতে গিয়ে বিচারপতি উনটওয়ালিয়া বলেন—নারী সংগঠনগুলোর গলাবাজি দ্বারা সুপ্রিম কোরটকে ভয় দেখান যাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে যদি সুপ্রিম কোরট গরিব মথুরার অপমান আর মনের ব্যথা না বুঝতে পারে তাহলে সে বিচার পাবে কার কাছ থেকে? নারী সংগঠনগুলোতো সুপ্রিম কোরটকে ভয় দেখাতে চায়নি; তারা এক নিষ্ঠুর আর প্রকাশ্য অবিচারের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল।

স্বনামধন্য আইনশিক্ষক প্রোফেসর উপেন্দ্র বকসি মনে করেন—ন্যায় ও বিচার ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই এক অঙ্গ। তাই মূল প্রশ্ন এই নয় যে সুপ্রিম কোরট রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে কি করবেন না। তাছাড়া সরকারই তো সব চাইতে বড় মামলা দায়ের-কারী বা অভিযোক্তা। আসল প্রশ্ন হল কি ধরনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে আদালত এবং কিসের পক্ষে—বিচারের, না ক্ষমতার? গতানুগতিকের, না নতুন প্রয়াসের? আশার না নিরাশার? এবং সর্বোপরি প্রশ্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে অথবা বিপক্ষে? ★

কলকাতার বড় হোটেলে, সন্ধ্যের পর

আর্য রায়





উইনডমিলের ধাঁচে গড়া পারক স্ট্রিটের এই বার-কাম-রেস্তোরাঁটির নাম মুলাঁ রোজ। বাইরের পাখাটা ধীরে ধীরে ঘুরেই চলেছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কালো টুপি পরা কেতাদুরস্ত লোকটি কাঠের দরজার একটি পাল্লা খুলে ধরল আলগোছে। দরজার মধ্যে দরজা। এবার ঘসা কাঁচের। সারা শরীরে আঁকিবুকি কাটা। সেটি খুলে ধরার লোক নেই। নিজেই ঠেলে ভেতরে ঢুকি। বাইরে মাঘের শীত। উইনডমিলের ভেতরের বাতাস ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটি তবুও চালু। স্বাভাবিক কারণেই শরীরে শিরশিরানি কাঁপুনি লাগল।

মুলাঁ রোজের মেঝেতে নরম কারপেট পাতা। তাতে পায়ের পাতা ডোবে। সরল-রেখায় সাজানো টেবিলের সারি। আবছা অন্ধকারে টেবিলে ঝুঁকে চেয়ার সোফায় বসা মানুষগুলোর অবয়ব বোঝা যায় শুধু, চটজলদি চেনা যায় না। ধাতস্থ হতে চোখজোড়া সময় নেয় কয়েক মুহূর্ত। একেবারে সামনের দিকে কোনায় দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি চোখে পড়ে, বাঁ দিকে ব্যানডসম্যানদের ডায়াস। কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন একটি মানুষ। এবার তাকে চিনতে পারি। স্টুয়ারড নামেই এদের পরিচয়। সুন্দর স্যুটে আগা-পাশতলা মোড়া মানুষটি টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে জিগেস করেন : আপনি একা? তাহলে এই টেবিলটিতে বসুন।

ক্যালকাটা বাই নাইট : অর্ধেক জীবনই তো কলকাতার হোটেল বার আর রেস্তোরাঁয়। কলকাতার তাবড় জীবন্ত হোটেল বার আর রেস্তোরাঁগুলি জড় হয়েছে পারক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী এবং ধর্মতলাতেই। ওখানে রূপ আছে রং আছে, রস আছে, চরস আছে, মদ আছে, মাতাল আছে, ব্যবসা আছে, বাসনা আছে। আর কী আছে? রাম আছে সীতা আছে, নিদ্রাহীন রাত আছে, সঙ্গে আছে জীবন। এ জীবনে জোয়ার আছে ভাঁটা নেই। একবার ঢোক, একটু বোস, একপেট খাও, একগলা গেলো। তারপর নিশুত রাতে কান ঝিমঝিম সঙ্গীত শুনে ঘরে ফের।

পারক স্ট্রিটে চাখতে গেলে পয়সা লাগে। ওটা পয়সাওলাদেরই লীলাক্ষেত্তর। এই এলাকায় এক বোতল বীয়ারের দামই পড়ে যায় গোটা পনেরো। কলকাতার বিভিন্ন এ-ক্লাস রেস্তোরাঁয় বার পনের টাকায় দুজনে পেট পুরে খাওয়া যায় : অথচ পারক স্ট্রিটে সেই মেনুই দর হাঁকবে দ্বিগুণ।

তবে দাম নিয়ে মাথাব্যথা নেই খদ্দেরদের। এখানে আনেওয়ালারা দুপাঁচশো ঘাবড়ায় না, হাজার হাজার লাখ লাখের কারবার ওদের। ভাবখানা এই—বেশি দাম দেবই তো। চার-দিকে লাল নীল হলুদ সবুজ মৃদু মৃদু আলো যেন জড়োয়ার ঝিলিক, বেয়ারার উর্দিগুলো কী সাদা, কাপ প্লেট গেলাস চামচ যেন এই মাত্র দোকান থেকে কেনা হল, ঘেন্না লাগার কোনও চানসই নেই। সব থেকে বড় কথা মেজাজ। পাশের লোকের তেল চিটচিটে গামছা থেকে বোটকা গন্ধ বেরোলে মদ্যপানের তৃপ্তিটা কোথায়, অ্যাঁ? এখানে সব বাবু মাতাল। মদ খেলে বাবুরা বিবিরা টকাটক ইংরিজী বলে, মারধোরের ভয় নেই, পকেট-মারের চিন্তা নেই, উটকো ঝুট ঝামেলা নেই, সেজন্যেই তো পারক স্ট্রিটে আসা। অন্য পাড়ায় যাও—বেরোনোর সময় থেকেই পেছনে লাগবে পাড়ার বাউণ্ডুলেগুলো। আওয়াজ দেবে—শালা মাল টেনেছে। আর পারক স্ট্রিট ধর্মতলা থেকে টলতে টলতে বেরোও, কেউ টুঁ শব্দটিও করবে না। বড় জোর পানের দোকানের ছেলেটা তার সঙ্গীকে বলবে, সাহাব বহুত ড্রিংক কিয়া আজ। এই হচ্ছে তফাত। অন্য জায়গায় লোকে মাল টানে আর পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলার লোকে ড্রিংক করে। মৌজের এই তফাতটুকুরই উলটো দিক সিকিউরিটি। মেজাজের সিকিউরিটি।

দিনে রেতে এই তল্লাট দুরকম। সকালের টিমেতালে চড়া সুর লাগে দুপুর নাগাদ। ওই সময় কোমপানির বাবুদের ভিড় হয়। হাতের অ্যাটাচি পাশে রেখে কুইক লানচের বন্দোবস্ত। সঙ্গে হয়ত স্রেফ দু-এক বোতল বীয়ার। তার-পর আবার কাজে ফেরা। আসে আশপাশের কলেজের ছেলেমেয়েরা। পারক স্ট্রিটের বার গুলোতেই কতজনের সঙ্গে কতজনের পরিচয়ের শুরু। তারপর প্রেম, বিবাহ, পুত্র, কন্যা সংসার, ডিভোর্স, আবার প্রেম। এখানে বছরে একটা করে ইলিয়াড লেখা হতে পারে।

আসে অফিসের বড় সাহেব সুন্দরী সেকরেটারির কোমরে আলতো হাত ছুঁইয়ে। চলো গো, একটু তোয়াজ করি তোমায়। ভোগে দেওয়ার আগে একটু মনটা ভেজাই। একটু নধর নধর হও। তারপরই তো মারব কোপ। পাঁঠাটিও জানে সে ভোগেই যাবে। তাই কোণের টেবিলের নিরালায় সাহেবের শরীর আধখানা হজম করে টাইয়ের নটটা ঠিক করে দেয়, লম্বা নখ দিয়ে ঝুলফির খোঁচা মারা চুলটাকে বাধ্য করে ঠিক জায়গায় থাকতে লুসভুস্ সেকরেটারি। এটুকু কনসেশন তো দিতেই হবে। নইলে মাসমাইনের প্যাকেটটি যে কৃশই থেকে যাবে চিরকাল।

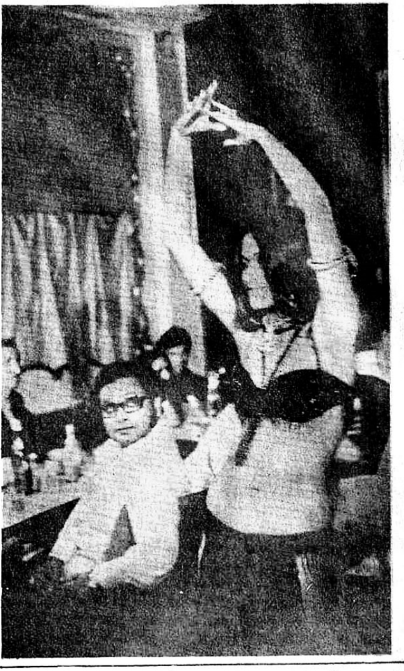
রাতে পারক স্ট্রিটের ভোল পালটায়। দিনে খাওয়া, রেতে গেলা। সাঁঝবেলা থেকেই প্রস্তুতি চলে। ব্যানডসম্যানরা চলে

আসে সব পাঁচটা নাগাদ। গ্যাপে গ্যাপে সেশন চলে কোথাও দশ, কোথাও এগার, কোথাও বা মাঝরাত্তির পর্যন্ত।

সন্ধ্যে থেকেই পারক স্ট্রিটের মজলিশ শুরু। দাদাবাবু দিদিমণিরা হাজির সাজুগুজু করে। কারো পরনে থ্রি পিস কমপ্লিট স্যুট, কারো জ্যাকেট আর জিনস। উইমেনস লিবের হাওয়ায় ব্রা-পুড়িয়ে-দেওয়া মেয়েরা শীতের দিনেও হাজির হয় পাতলা বুবিয়ার শারট আর জিনস পরে। রক্ত তো এমনিতেই গরম, পশমের তাই দরকার কি? নাভির নিচে জিনসের রিম আর নাভির চার আঙুলে ওপরে শারটের কোণা দুটো গিট দিয়ে বাঁধা। কারো পরনে শাড়ি আর সারা পিঠ খোলা রাখা হলটার নেক ব্লাউজ। পাঠান ড্রেসে নিখুঁত সেজে কেউ কেউ বসে প্রিয়তমের কোল ঘেঁসে। দুটো চেয়ারের দরকার কি, একটাই তো কাফি? একজন লম্বা শুতে পারে এমন সোফার এককোণে জড়সড় এক নব দম্পতি। পিঠ ভরতি চুলের ঢাল, সিঁথিভরতি টকটকে সিগন্যাল। পতি দেবতাটি, সেরকমই তো লাগছে, মৃদুস্বরে বলে, বিয়র খেতে হয় ঢক ঢক করে, হুইসকি খাবে চুকচুক করে। বিয়রের মজা গলার আলটাগরায়, হুইসকির জিভে। কান খাড়া রেখে এসব কথা শুনতে হয়। ঠিক পকেটমারের চরিত্র। এই বুঝি কেউ দেখে ফেলে, এই বুঝি ওরা টের পায় ওদের কথা গিলছে। স্বামীর কথায় নবা স্ত্রী ঢকঢক করে দুচুমুক টেনে নেয়। তারপরই নাসিকাকুঞ্চন। ভুরু জোড়ার মাঝখানের জমিতে তিনচারটি ভাঁজ পড়ে। মৃদু অনুযোগ, দূর, ভাল না খেতে। তেতো তেতো। স্বামীর চোখে খুশির ঝিলিক। আস্তে আস্তে ঠিক সয়ে যাবে দেখখন। খাও খাও, পারটিতে গেলে করবেটা কী?

আর কোনও দ্বিধা নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় স্বামী এসেছে স্ত্রীকে মড করতে। চালু মাল, পাক্কা কেরিয়ারিসট। জীবনে ওপরে ওঠার সিঁড়িটির হদিশ পেয়ে গেছে বাছাধন।

বিচিত্র এ তল্লাটের জীবন। বিচিত্র এখানকার খদ্দের। পকেট-গরম বিলাসীদের দল। কেউ আসে মন ভোলাতে, কেউ আসে ভুলতে। শুধু একটি চরিত্র ভোলা যায় না। ভদ্রলোক, ভদ্রলোকই বটে. প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসেন ট্রিংকাসে। নির্দিষ্ট একটি টেবিল আছে ওর মনের মতো। সেখানেই তিনি বসেন। প্রতিদিন। কোনও পানীয়ের টলটলে মাধুর্য ওর সামনে অপেক্ষায় থাকে না। স্রেফ এককাপ কফি। ঘণ্টাদুয়েক কাবার করে রাত আটটা নাগাদ উঠে যান। কোনও চাঞ্চল্যের প্রকাশ নেই ওর মুখে। কেউ



কোনও কথাও শোনায় না। দীর্ঘ কবছর ধরে এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দেখে আসছে ট্রিংকাসের বেয়ারা স্টুয়ারড আর গাইয়ে বাজিয়েরা। সকলের চোখেই বিস্ময় ঝরে —কী সুখের সন্ধানে আসেন উনি? কিসের সুখ?

অনুপ ট্রিংকাসে বাজনা বাজায়। বলল ঃ এটা ওর বিলাসিতা মনে হয়। তবে যাই হোক না কেন ট্রিংকাসের উনি বাঁধা খদ্দের।

পারক স্ট্রিটের সব বারেই এমন বাঁধা খদ্দের প্রচুর। নতুন মুখও দেখা যায় নিত্য। সাপ্লায়ার আসে পারচেজারকে খুশি করাতে। আকণ্ঠ গিলিয়ে একপেট খাইয়ে নিচু গলায় সভয়ে প্রশ্ন করে. স্যার ওই ব্যবস্থাটা করব কি? সারের পৃথুল শরীরে সুড়সুড়ি জাগলো সম্মতি হয়ত মেলে। আনন্দে উৎফুল্ল সাপ্লায়ার বার থেকেই ফোন করে ঃ হ্যালো মালতি? দাদা বলছি। আজ রাতটাকে ফ্রি রেখ।

মাঝে মধ্যে বারের ঘোরে, ঝটকা মারে হুজ্জুতি পারটিগুলো। একসঙ্গে দল বেঁধে ঢোকে সব। তারপর সামান্য অজুহাতে হাওয়া তাতায় ওরা। এটা কি গান হচ্ছে? এটা কি নাচ হচ্ছে? একে কি খাবার বলে? এই খাবারের এই দাম? ব্যস। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে শান্তিকামীর দল। নিরীহরা সুটসাট বিল মিটিয়ে ভেগে যায়। একটু পরেই ঝন-ঝন ভেঙে পড়ে দরজার কাঁচ, পানীয়ের গ্লাস। দমাদ্দম চেয়ার ওলটায়, ওলটায় টেবিল। এক

ক্ষ'াকে সব হাওয়া। ম্যানেজার পরের দিন হিসেব মিলিয়ে মালিককে বলে, স্যর, গতকাল সব সমেত লস হয়েছে মোর দ্যান…।

চীনাদের একটা দল পারক স্ট্রিটে আসে কি রবিবার বিকেল নাগাদ। ট্যাংরা থেকে আসে সব। বিশ পঁচিশটা স্কুটারের লাইন পড়ে যায় পারক হোটেলের সামনে। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ফুর্তি চলে। সপ্তর হয় আরও সাতটা দিনের শান্তি।

ফ্যামিলি নিয়েও প্রতিদিন আসে অনেকেই। এসব খদ্দেরের জন্যে ছজন কি আটজনের বসার মতো রয়েছে টেবিল ও সোফার বন্দোবস্ত। কারো জন্মদিনের প্যারটি, কারো বিবাহ বার্ষিকী, কারো প্রমোশন, কারো বিজনেসে অভাবিত লাভ। উপলক্ষ একটা না একটা ঠিকই বের হয়ে যায়। বড়লোকদের ছানাপোনা সব। যত না খাবে নষ্ট করবে তার বেশি। বয়েই গেল। চেটেপুটে খেলে বেয়ারা স্টুয়ার্ডরা ভাববেটা কী? মনে মনে বলবে আদেখলার পোণা সব। জীবনে যেন এই প্রথম খাচ্ছে।

আসে উঠতি খোকাখুকুরা। ওদের বাবা মাঞ্জা সমাজের হাই আপস্। দঙ্গল বেঁধে বসে সব। একটার পর একটা বোতল খালি হয়, একটার পর একটা সিগারেট পোড়ে। গানের সঙ্গে একটু উঠে নাচ, নাচের সঙ্গে তাল দিতে দিতে একসময় সব মাতাল। স্টুয়ার্ড এসে তুলে ধরে। দুবাহুতে শক্তি টেনে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে হয়। আঠারো থেকে পঁচিশের খোকাখুকুদের। এখানে সময় সময় জব্বর টিপস মেলে। বেয়ারারা তাই হুঁশিয়ার। লোল লোল চোখে খোকাখুকুদের সবসময় ঠাওর হয়না কোনটা দশ কোনটা বিশ। যে কোনও একটা ঠেকিয়ে দেয়। কৃতজ্ঞ বেয়ারা একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে মোটরের দরজা খুলে ধরে। গেটকীপার ক্ষুণ্ন হয়। ভেতরে ঢোকে খোকাখুকুর দল। আঃ, পরম শান্তি।

পারক স্ট্রিটে সব জায়গায় ইচ্ছেমত নাচের সুযোগ কিন্তু মেলেনা। ট্রিংকাস, মুল'রোজ, ব্লু ফক্স, ০০৭, কোয়ালিটি, ম্যাগসে এক-কথায় বলতে গেলে নাচের চানস মেলে খুবই কম। সব জায়গায় ফ্লোরও নেই। দু একটা জায়গায় গানবাজনাও হয় না। যেখানে ফ্লোর আছে নেশার ঝটকায় গান শুনে কেউ কেউ তেতে উঠে ফ্লোরে নেমে যায়। স্টুয়ার্ডরা কায়দা করে বসিয়ে দেয়।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে যাদের শরীর দোলে, রক্তটা চনমনে হয়ে ওঠে তারা তাই যায় ইন অ্যানড আউটে। পারক হোটেল।

ইন অ্যানড আউটের মজাটাই আলাদা। একা ওখানে প্রবেশ নিষেধ। দোকা তাই জোটাতে হয়। ছোঁড়া ঢোকে বুড়িকে বগল-দাবা করে, বুড়ি ঢোকে ছোঁড়ার কোমর ধরে। ঢুকতে গেলে টিকিট কাটতে হয় ওখানে। টিকিটের দাম বিল থেকে মাইনাস হয় একমাত্র বিলে অংকের পরিমাণ টিকিটের চেয়ে বেশি হলে। ঢোকা খাওয়া টানা আর নাচ। নাচ আর নাচ। একা ফ্লোরে নামা যায় না। সঙ্গীকে ভাই চাই। পাশের টেবিলের বিড়ালাক্ষীকে মনে ধরলে প্রস্তাবও করা যায়। প্রত্যাখ্যানের ভয় আছে, তবে লাজ নেই। ডিসকোর নিয়মই এটা।

ডিসকোর চল খুব দিল্লিতে। একটার পর একটা রেকরড বেজে যায় এলভিস থেকে স্যাটারডে নাইট ফিভার। সঙ্গে ফ্লোরে জোড়ায় জোড়ায় নাচ। এক একটা গানের সঙ্গে এক এক ধরনের নাচ। পায়ে পায়ে ঠেকাঠেকি, হাঁটু হাঁটু ঠেকাঠেকি, ঊরু ঊরু ঠেকাঠেকি, বুকে বুকে ঠেকাঠেকি, পেছন ফিরে পিঠে পিঠে ঠেকাঠেকি, পাছা পাছা ঠেকাঠেকি হাতে হাতে তালি তালি। বার-বার, ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে, ওঠ বোস, কত কী! একসময় গান থামে। পাঁচ দশ মিনিটের জন্যে হাঁফ ফেলার বিরতি। যে যার টেবিলে ফিরে আসে। চটপট গলায় পড়ে পানীয়। কেউ কেউ কুইক কিক চায়। হিপপকেট থেকে ফয়েল খুলে ছোট্ট মুসুর দানার মতো ট্যাবলেট গিলে ফেলে টুক করে। আবার গান শুরু। আবার নাচ। সব মিলিয়ে হুজ্জুতির একশেষ।

এই মাপজোক করা লিমিটেড ভদ্র হুজ্জুতিটুকুই পারক স্ট্রিটের বার কাম রেস্তোর'ার মালিকদের মন পসন্দ। মালিকেরা জানে গান বাজনা হলে খদ্দেররা থাকবে বসবে খাবে আর গিলবে বেশি। গানবাজনা বন্ধ, বিলে আউটপুটও কম। অধিকাংশ ঘরেই তাই মিউজিক প্যারটি। মহম্মদ রফি আলাপ শেষে চড়া সুরে ধরে: ইয়ে দুনিয়াকে রাখবালে…'।

কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ, বহুত আচ্ছা, আহা-হা করে গুঞ্জন শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে। চক চক দুটো ডিপ্লোম্যাট গলায় পড়ে। কুড়-কুড় করে টেবিলে ওঠে শব্দ। ঘাড় বেঁকিয়ে কেউ কেউ তাল দেয়, কেউ বেয়ারাকে ডেকে বলে দেহ'খানা থোড়া বাদ মে ভেজ, অভি ফিন দো বড়া পেগ লে আও, আউর দো বিয়ার'। ম্যানেজার, মালিক মুচকি হাসে। সাবাশ রফি, চালিয়ে যাও।

রফির প্রোগ্রাম শেষ হলেই আশার পালা। সুন্দরী আশাকে প্রতিদিনই সেক্সি লাগে। ইতিমধ্যেই 'সিলিপ' চলে গেছে বেশ কয়েকটা। মুচকি হেসে আশা সামনে দাঁড়ায়। মাউথপিসটা ঠোঁটের তিন ইঞ্চি দূরে রেখে চাপা গলায় বলে: লিজিয়ে, আপকো অনুরোধমে ফিলিম অমুক কা ইয়ে গানা। তারপর ঝিনিক ঝিনিক গলায় সুর ওঠে—'পিয়া তু-উ-উ আব তো আজা…'। ঝিং ঝি ঝি, ঝিং ঝি ঝি, ঝিং ঝি ঝি, ঝিং ঝি ঝি।

অনেকেই ক্ষেপে ওঠে। ঢকাঢক গিলে ফেলে ফ্লোরে নেমে আসে কেউ কেউ। স্টুয়ারডরা কায়দা করে বাধা দেয়। বাড়তে দিলেই ঝামেলা। কোমর ধরে বসিয়ে দেয় ঠিক টেবিলে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলে: 'উইল য়্যু টেক ইওর ডিনার প্লিজ?' খদ্দের হ্যাঁ না কিছুই হয়ত বলে না। আবার উঠতে চায়। একটু নাচলে হতো না? খাবারটা নয় মিনিট দশেক পরেই খেতাম? স্টুয়ারড এবার চাপা গাম্ভীর্য এনে মুখ নিচু করে স্পষ্ট ভাষায় কেটে কেটে বলে—মাইলা ছাড়া আমরা ফ্লোরে নামতে অ্যালাউ করি না মিসটার। অগত্যা চেয়ারে বসেই কোমর দোলায়, তাল ঠোকে। রকমসকম দেখে পাশের টেবিলের পানপাতা মুখের মেয়েটি তার পাশের পুরুষের কাঁধে আলগোছে মাথা রাখে। চোখদুটো অনেক কষ্টে খুলে রাখতে হয়। জিভটায় কেমন যেন টান ধরেছে। মাত্রাটা কি বেশি?

'হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ—সর্বত্যাগী শঙ্কর'। দেখ, শুধু দেখে যাও স্বামীজী। দেখ তোমার সাধের ভারতবর্ষ। নারীজাতি? গরম লাগে তাই চুল ছেঁটেছি, ভুরু আঁকিনা শুধুই, তুলে ফেলে সরুও করেছি। শাড়ি পরি প্যানটও পরি, ম্যাকসি পরি মিডিও পরি: বন্ধু জুটিয়ে বারে বসেছি। মদ সিগারেট? ওদুটো তো নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরই মতো জরুরী স্বামীজী। তুমি বলেছিলে না—ওরে, জন্মেছিস যদি দাগ রেখে যা? একটু



এডিট কর প্লিজ ওই কথাটার। বল—ওরে জন্মেছিস যদি ভোগ করে যা। বেয়ারা হুইস্কি লে আও। এই তো জীবন। ভোগ করে যা।

॥ ২ ॥

এই ভোগের কথাটা চাগলেই মনটা উড়ু উড়ু হয়। খাব দাব গিলব টানব নাচ দেখব গান শুনব আর নরম নরম শরীর ভোগ করব এই না হলে জীবন? একসঙ্গে সবকটা চাই। চাওয়া মাত্রই পাওয়া। হাতের কাছে। যাবটা কোথায়? ভোগীদের ঠিকানা বাতলাতে হয় না। সুড়সুড় করে ভেগে পড়ে সব পারক স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা। টেমপল বার। ভোগের পীঠস্থান। টেমপল—ভোগের একেবারে চূড়ান্ত।

অপেরা সিনেমাকে সামনে আর নিউ সিনেমাকে বাঁদিকে পাহারায় রেখে সাকির মাথায় চড়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হুল্লোড় করে টেমপল। নিওন সাইন দেখে বোঝবার উপায় নেই সাকি আর টেমপল এক মায়েরই যমজ সন্তান। একতলায় সাকি, দোতলায় টেমপল! সাকি শান্ত, নির্লিপ্ত, মাত্রাহীন হুল্লোড় করে না। টেমপল অশান্ত, দুরন্ত দামাল। জীবন ওখানে উথলে পড়ে।

টেমপলে ঢুকতে সেলাম বসতে সেলাম খেতে সেলাম টিপসে সেলাম বেরোতেও সেলাম। ওরা ঢুকছে বসছে হাসছে নাচছে খাচ্ছে টানছে আর কাউকে বগলদাবা করে গুডনাইট জানাচ্ছে। চাইলে ওরা তো আসবেই, না চাইলেও আসবে। খদ্দেরের পাশে বসবে, সিগারেট পোড়াবে, গেলাসে চুমুক দেবে, একটু আধটু ছেনালি করবে আর দশ টাকা বখ করে আসছি বলে পাশের টেবিলে গিয়ে আবার গিলবে পোড়াবে ছেনালি করবে বধ করবে।

টেমপলে ঢুকতে গেলেই হুঁশিয়ারীটা চোখে পড়ে। রঙিন মোটা কাগজে ইংরিজিতে বড় বড় করে লেখা: সাবধান, ভেতরে একপাল পাগলা কুকুর। প্রথম ঢুকলেও সেরকমই মনে হয়। যেন এইমাত্র একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে গেছে, আবার একটু পরেই ঘটবে মারদাঙ্গা। ঝমঝম করে বাজনা বাজছে, গমগম করে গান হচ্ছে, ছমছম করে নাচ হচ্ছে, ভনভন করে মেয়েরা ঘুরছে। নাচ মানে ক্যাবারের ঢঙে খ্যামটা। সামনেটা এক চিলতে ফাঁকা। সেখানেই গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিবসনা নারীর কোমর দোলানো অদ্ভুত ধরনের খ্যামটা। তেতে ওঠা লোকেরা চিল্লিয়ে ওঠে, 'ঘুরে ঘুরে, ফিন দেখাও'। নাচিয়ে একটু ভুরু কোঁচকায়। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে। বাজনা বাজে আরও জোরে, কোমর দোলে সুরে সুরে, মোহিনী





আসে স্বপ্ন নিয়ে—মাতালদের ঠিক কি, দশ দিতে যদি বিশ দিয়ে দেয়।

বাঙালী এখানে কম। আরও কম অবাঙালী ভারতীয়। চোখে পড়ে বিদেশীরা। জাহাজঘাটার বিদেশী সব। যেমন রং তেমনই চেহারা। ঝাঁকড়া চুল কোঁকড়া চুল, সাদা চামড়া কালো চামড়া হাতে মার্লবোরো বা কেনটের প্যাকেট নিয়ে সাকি আর সুরাতে তনুমন ভেজাতে এখানে আসে। মোহিনীরাও ওদের চায়। ওদের পাশেই ভনভনানি বেশি। গা ঘেঁসে বসে টকাটক হাম দিচ্ছে হাম খাচ্ছে। বুকে মাথায় কাটছে বিলি। এভাবেই তাতিয়ে তুতিয়ে দুধ দোওয়ানো আর কি। ওদের পকেটেই তো জোয়ারের টান।

একসময় হুট করে দশটা বেজে যায়। শেষ হয় গান আর খ্যামটার অধিবেশন। পরবর্তী অধিবেশন দশ মিনিট পর। ততক্ষণ টেবিল চেয়ার ওলটপালট হয়ে ফাঁকা হয় সামনেটা। ঝমপর ঝমপর গানবাজনার পারটি ওপরে চলে যায় পেছনের সিঁড়ি দিয়ে। রাত দশটার পর শুধু ইংরিজি সেশন। এবার ডিসকো। ওপরে শুরু হয় ওয়েসটার্ন মিউজিক নিচে ফ্লোরে জোড়ায় জোড়ায় নাচ। নাচতে চাইলে মোহিনী আছে। ডাক আর ফ্লোরে নাম। মিনিমাম দশ, ম্যাকসিমামের কোনও লিমিট নেই।

তুমি কি মোহিনী পাকড়াতে চাও? তবে ডেকে নাও। লজ্জার বালাই রেখ না: ইচ্ছে হলে ডেকে বোস। আমিও ডেকেছিলাম প্রথম দিনই: ঘণ্টা দুয়েক ধাতস্থ হবার পর চুক চুক করে জিভে আওয়াজ তুলে।

মেয়েটা আমায় অবাক করেছিল। ইংরিজি বলা প্যান্টুল পরা কলকে ফুলের মত একরাশ মোহিনীর মাঝে গাব্বাগোব্বা একগাল হাসি হাসা মেয়েটি। চুক চুক আওয়াজ শুনে ভুরু বেঁকিয়েছিল। ট্যারা চোখে তাচ্ছিল্যের ভাব—যেন ওই আওয়াজেই অর্ধেক অসতী হয়ে গেছে। মরি মরি।

ও শুনেছিল। কাছে আসে। ডানহাতের থাবা দিয়ে আমার বাঁ উরুতে ভর রেখে বসতে বলার আগেই ধপাস। ওর গুরু নিতম্বের তলায় চাপা পড়ে আমার বাঁ উরু। ডান হাত দিয়ে বেড় দেয় আমায় আর পরক্ষণেই নাক সিঁটকোয় চারমিনারের প্যাকেট দেখে। শুরুতেই বিপর্যয়। এখানে কত দামি দামি সিগারেট চলে আর তোমার কিনা চারমিনার?

'চারমিনার বড্ড কড়া'। কেমন অনুযোগের সুর ফোটে ওর গলায়। দেয়ালে ওমর খৈয়াম হাসছে। পাশে গোমড়ামুখী মোহিনী! এও কি হয়? গালে টুসকি মেরে বললাম: ওটা তোমার নয়? তোমার জন্যে বিদেশী মাল। বারের সিগারেটওলাকে ডেকে দেড়গুণ দাম দিয়ে এক প্যাকেট বিদেশী সিগারেট কিনি মন রাখতে। তারপর বলি: এই নাও সবিতা সুন্দরী, পুরোটাই তোমার। খুশির প্রকাশ পাই তৎক্ষণাৎ। ডান হাতের বেড় আরও শক্ত হয়।

॥ ৩ ॥

করপোরেশনের লালবাড়ির পেছনেই বিখ্যাত আমিনিয়া রেস্তোরাঁ। তার ঠিক লাগোয়া প্যারিস বার। তারও ওপাশে নিজাম। দশটা থেকে দশটা প্যারিস খোলা আর অন্য সব দিনের মতোই বৃহস্পতিবার বন্ধ। আমি গিয়েছিলাম শনিবার।

বাঁদিকের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই বুরবাক আদমি বা নাকান্দা লোকগুলোকে থেকে যেতে হয়। বিশাল হল ঘর আর সার সার মেয়ে। ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ছে আর গলাগলি করে বসে চুকচুক করে মদ গিলছে। কী টানতে আর গিলতে পারে রে বাবা মেয়েগুলো! জ্যান্ত পিপে সব।

এক ফোঁটা টলে না ! তবে টলিয়ে ছাড়ে।

নিরিবিলির বালাই নেই। তাই ডান-দিকের কোণের টেবিলটা পছন্দ করে বসে পড়লাম। পেছনেই ঝমপর ঝমপর পারটি একটা ডায়াসের ওপর। আর তিনদিক ঘিরে ষোলটা কেবিন। একটারও গায়ে কিন্তু পর্দা নেই।

এসব জায়গায় নিরিবিলি না থাকলে, কেবিনে আড়াল না থাকলে একটু-আধটু অস্বস্তি লাগে না কি ? কি জানি। লোক-গুলোর হাবভাব দেখে অস্বস্তি-টস্বস্তি হয় বলে তো মনেও হচ্ছে না। দিব্যি মস্করা করে যাচ্ছে মেয়েছেলের সঙ্গে। ঘাড়ে বুকে পিঠে পাছায় দেদার হাত বুলোচ্ছে। কোনওরকম লজ্জাশরমের বালাই-ই নেই। যত লজ্জা যেন আমারই। অবশ্য হবেই তো। আনকা আদমি এসব জায়গায় যে আসে না।

প্যারিসের নামটুকুই যা বিদেশী বিদেশী, লোভনীয়। সামনের টেবিলের ওপর যেটা ঢাকনা, তাকে ন্যাকড়াই বলা যায়। তার ওপর আবার সেদ্ধ ছোলা আর ডালমুট ছড়ানো ছিটোনো। সেগুলো ঝেড়ে ফেলে ঢাকনাটা পরিপাটি টানটান করে বেয়ারাটা হুকুম নিয়ে দাঁড়ায়। অরডার দিয়ে আমি লোক দেখতে থাকি।

আধাআধি বাচ্চা ছেলে। বুড়ো হাবড়ার দলও রয়েছে। মুখে তিনদিনের না কামানো দাড়ি, জামার ওপরে লুঙ্গির গিঁট। তেরছে হেলে বসে রয়েছে চার-পাঁচটা ছেলে। রঙিন কাজ করা পানজাবী পরনে। খাবার বলতে গেলে কোনও টেবিলেই চোখে পড়ল না। বিয়ারের বোতলই বেশি। সঙ্গে ডিসে করে

অশোক বসু



দিয়েই প্যারিসের মোহিনী ডাকতে হয়। টেমপলের মতো নয়। ওখানে ইশারাতেই চলে আসে।

মেয়েটি আসে। মুখটি পাকা নয়। ছিপছিপে শরীর। ততক্ষণে অনেকটাই পেটে পড়েছে। চোখ দুটো তাই শরীরের মতোই একটু বেতাল। পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ওর জন্যে চলে এল এক বড়া পেগ হুইসকি।

আমি ঝট করে বললাম : মুন্নি, কিছু খাবে ?

মুন্নি চোখ তোলে। একটু ঘোর লেগেছে। অল্প ঘাড় নেড়ে বলল : না।

ততক্ষণে ওর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়েছি। গলায় ঢালিয়েছি আরও দু'পেগ। তারপর মওকা বুঝে এক সময় দুম করে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি এমনিতেই ঢুকতে

কেবিনগুলো দেখে নানকিংয়ের কথা মনে পড়ে। পোদ্দার কোর্টের কাছেই নানকিং বার। সেখানে দিনদুপুরেই ঝড় ওঠে। ওখানে এর চেয়েও বড় কেবিন আছে, কেবিনে আড়াল আছে। বিরাট টেবিল আছে। নাছোড়বান্দা মেয়েও অনেক। ইশারা পেলেই কেবিনে ঢুকে পড়ে। তারপর মর্জিমাফিক খাবারের অরডার দেয়, ড্রিংকসেরও। খেয়ে-দেয়ে সিগারেট ধরিয়ে গেলাসে দুটো চুমুক দিয়ে আড়চোখে জিজ্ঞেস করে, কি হবে তো ? বেয়ারা এসে টেবিলের সাদা চাদরটা ভাঁজ করে চেয়ারের ওপর রেখে বেরিয়ে যায়। কুড়িটা কড়কড়ে নোট বুকে গুঁজে মেয়েটা আবার কেবিনের বাইরে গিয়ে বসে। ভোগী মদ মাংসের বিল মিটিয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে বাইরে বেরিয়ে যায়।

সেদ্ধ ছোলা, কাঁচা লংকা আর ডালমুট। এক টেবিলে ঘোড়ার বই খুলে কয়েকজন মাঝবয়সী বিলাপ করছে। আরে ইয়ার কওন শালে সোচা থা সান লায়ন কামাল করেগা ? ডার্বির স্টেক ছিল সেদিন কলকাতার রেস-কোর্সে। হেরে গেছে বলেই কি ওরা এখানে এসেছে ? কি জানি হবে হয়ত। এসেছে শোক ভুলতে। আবার জিতলেও আসত। আসত ফূর্তি লুটতে। দুই হেরোকে সান্ত্বন দেয় একজন। আরে ইয়ার ছোড়ো ওহি বাত। রুবিকো বোলাও। রুবিরা বসে আছে লাইন দিয়ে।

আধঘণ্টা পর বেয়ারাটি ঘুরঘুর শুরু করল। বিনা কারণে দু-একবার বলেও ফেলল 'কুছ মাংতা সাহাব ?' শেষে আমিই ওকে ডাকি।

ততক্ষণ হালচাল বুঝে গেছি। বেয়ারা দেয় ?

মুন্নি চমকে উঠেছিল। কিন্তু বিশ টাকার মোক্ষম চালটা চালতেই থম মেরে বসে যায়। তারপর গড়গড় করে বলে গেল অনেক কিছু। এবং সব শেষে জড়ানো গলায়, ঢুলু ঢুলু চোখে, ঢলঢলে ভাষায় বলল : মুন্নি নামটা ভুলেই গিয়েছিলাম। চোদ্দ হাজার নাম তো আমাদের। জামা কাপড় ব্যবহারের মতোই একটা ছাড়ি একটা ধরি। মুন্নি বলেও কেউ হয়ত ডাকত কোনওদিন। হাঃ, আসলটাই ভুলে মেরে দিয়েছি।

টেমপলের সবিতা আর প্যারিসের মুন্নির কথাগুলো সাজিয়ে দেখা যাক কেমন দাঁড়ায় ব্যাপারটা।

সবিতা : এটা আমাদের একটা কেলাব বলতে পারেন। নাইট কেলাব, বুঝলেন

নাকি ?

মুন্নি : খদ্দের ধরার সেফ প্লেস এটাই। ভয় নেই। বন্দোবস্ত আছে।

সবিতা : ভয় এখানেও নেই। হুজ্জুতি করলে এদের মস্তান আছে! ঘাড় ধরে পাছায় লাথি মেরে ভাগিয়ে দেবে।

আমার কিন্তু সত্যিই একটু ভয় ভয় করছিল। তিন হাত দূরের টেবিলটায় একটা লোক উত্তেজিত। পাশের মেয়েটিও তাই। দুজনে বেশ চাপা গলায় ঝগড়া করছে বোঝা যায়। মেয়েটা একবার উঠে যেতে চাইল। থয়াথপ্পরে চেহারার লোকটা জোর করে ওর হাত টেনে ধরে। ঝনঝন করে একটা বিয়রের বোতল মেঝেয় পড়ে যায়। গান-বাজনা থেমে যায় হঠাৎ। জাহাজীগুলোকে সন্ত্রস্ত হতে দেখে এগিয়ে আসে দুটি লোক। সবচেয়ে সামনে যে দাঁড়িয়ে তার শরীরে মঙ্গোলীয় রক্ত প্রবহমান। পাতলা সরু গোঁফ দাঁড়িপাল্লার মতো চিবুক গড়িয়ে নেমেছে। অবলীলায় থরাথপ্পরেকে সে উঠিয়ে নেয়। তারপর এগোতে থাকে দরজার দিকে। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। সবিতার ডান হাতের বেড় তা ভাঙায়। তারপর ফিসফিস করে বলে : ওই চীনাটা এখানকার লীডার। আচ্ছা আচ্ছা মস্তানও এখানে ওর সামনে কেঁচো। হুজ্জুতি ঠাণ্ডা করার ও হচ্ছে মাসটার। হুজ্জুতি যে করবে সে এখানে লাথি খাবে, গেটেও লাথি খাবে। দরকার হলে রাস্তার রিকসোওলারাও পেঁদাবে। মাস্তানি এখানে চলবে না। বন্দোবস্ত এখানে সব পাক্কা। ওই যে ভদ্রলোকটাকে দেখছেন—

আমি তাকাই। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। নীলচে স্যুট। একটু পুরোন ধাঁচের, পায়ে চটি। ফরসা রং। দাড়ি গোঁফ মসৃণভাবে কামানো। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। হেসে হেসে কথা বলছেন, ঠাট্টা ইয়ারকি করছেন মেয়েগুলোর সঙ্গে।

আমি বলি, হ্যাঁ, উনি কে?

সবিতা বলল : উনি চৌধুরী সাহাব। পুলিশের বড়বাবু। ফি রোজ সন্ধ্যায় এখানে ঠেক্কা ঠাপ। মানেটা বুঝলেন নাকি? ঝুট-ঝামেলা করে টেমপলে কেউ পার পাবে না।

মুন্নি : আমরা ঢুকতে গেলেই দশ টাকা দিই। পার ডে। মালিককে।

সবিতা : আমরা দিই একুশ টাকা। মাসে পঁচিশ দিন। বাকি পাঁচ দিন আসতে পারলে আসি। নাহলে আসি না। অন্যদিন কামাই করলে ভাগ ভাগ করে ফাইন দিয়ে টাকাটা পুষিয়ে দিতে হয়। মালিক ভাবে আমরা না এলে খদ্দেরও আসবে না। আমরাই হলাম লক্ষ্মী। সতীলক্ষ্মী, হিঃ হিঃ।

মুন্নি : আমাদেরও ছুটিছাটা আছে।



অশোক বসু

মালিককে বললেই হল। তবে বেশি কামাই করলে ফের ঢুকতে অসুবিধে হয়। খদ্দেররা তো আমাদের জন্যেই আসে। নাকি বলুন?

সবিতা : আমাদের সঙ্গে কত্তা কইলেই দশ টাকা। আমাদের ইচ্ছে হলে খাওয়াতেও হবে। কিপটেমি করলে কিন্তু উঠে যাই।

মুন্নি : আমাদেরও। তবে আমরা খাই না খুব একটা। খালি টানি। টানতেই মৌজ।

সবিতা : আমাদের কাউকে মনে ধরলে এখান থেকেই খদ্দেররা তুলে নিয়ে যেতে পারে। বাইরে রিকসো ফিট, ট্যাক্সি ফিট। আমি থাকি হোয়াইট হলে। বাকিরা কেউ কিড ইসটিট, কেউ ইলিয়ট রোড, কেউ সোনাগাছি। আমাদের জায়গায় গেলে ভাল। তোমাদের ফেলাটেও হোল নাইট থাকতে পারি। মাল লকাতে হবে কিন্তু বেশি। তা খদ্দের জুটলে এক রাতেই দেড় দু'শ পর্যন্ত হয়ে যায়। না জুটলে এই এ টেবিল সে টেবিল ঘুরে গোটা পঞ্চাশ তো থাকেই।

মুন্নি : আমাদের প্যারিসে রহিস আদমী বড় একটা আসে না। মাঝে মধ্যে ফুট করে ঢুকে পড়ে। আসে বটে-টেমপলে। এখানে ইনকাম তাই কম। অবশ্য যা হয় নিজেরটা তাতে চলেই যায়। তবে হ্যাঁ, এখানে ঢোকাটা অত সহজ নয়। ক্যারেকটার সার্টিফিকেট লাগে।

ক্যারেকটার সারটিফিকেট? তখনই আমি হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। বলে কি মুন্নি?

মুন্নি : হ্যাঁ, আলবৎ ঠিক বলেছি। আমাদের এখানে ফরম আছে। সেটা ভর্তি করতে হয়। কাসটমারদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করব, হুজ্জুতি যে করব না সেজন্য জান পহেচান আদমীর কাছ থেকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আনতে হয়। ঢোকাটা অত সহজ নয়। বুঝলেন নাকি?

সবিতা : এখানে বাঙালী আমরা কয়েক-জন। বাকি বেশীই অ্যাংলো, জাহাজঘাটার সাহেব বেশি আসে তো তাই ওদেরই রমরমা বেশি। আর তোমাদের মতো বাবুরা এলে আমাদেরই অবশ্য টানে। হাজার হলেও মাতৃভাষায় কত্তা কইতেই তো সুক। তবে সাহেবগুলোই কিন্তু মাল বেশি দেয়। আর সুক পেলে তো কথাই নেই। যে কদিন থাকবে ফি রোজ আসবে। ধামসা ধামসি করবে। চলে যাবার সময় কেউ কেউ আবার পেজেনটেশানও দিয়ে যায়। কেউ ঘড়ি কেউ ছাতা। এক সাহেব তো একবার সোনার চেনটাই দিয়ে গেল। না না, আমাকে নয়। ওই ফিরিঙ্গীর বেটিটাকে। কী খেলা খেলিয়েছিল।

রাত সাড়ে বারটা বাজবে কি টেমপলের জীবন থমকে যায়। একটা দিন শেষ হল। রাতটুকু বাকি। মুন্নিরা দশটায় ডেরায় ফিরেছে। সবিতারা খদ্দের আঁকড়ে যাচ্ছে সাড়ে বারটার পর। বাইরে ট্যাকসি আর রিকসার লাইন। এ তল্লাটের রিকসাগুলো মুখে কোনও আওয়াজ করে না। খালি ঠুংঠুং শব্দ বাজায়। কেউ একা ওঠে কেউ কেউ দোকা। সবিতাদের জন্যে ওদেরও রাত জাগতে হয়। বাবুরা বিবিরা ফুর্তি লুটবে আর এই রাতভিরেতে ওদের দুটো পয়সা আসবে। দুটো পয়সার জন্যেই তো বেঁচে থাকা। আর কি দিয়েছে আল্লা ওদের?

॥ ৪ ॥

পিটার বলল : দাদা, এতক্ষণ তো একটা জীবনের কথাই লিখলেন। অন্য দিকটাও দেখুন। পার্ক স্ট্রিটের সব বারেই মদ পাওয়া যায়, সব পানের দোকানেই চরস, ভাঙ পাওয়া যায়, সব বাড়িতেই মেয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু এ তল্লাটের হোটেল বারগুলোকে যারা মাতিয়ে রেখেছে তাদের কথাও একটু লিখুন। না হলে যে ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

পিটার পার্ক স্ট্রিটের স্টুয়ারড। অভিজ্ঞতা ওর আট বছরের।

পিটার সব দেখিয়ে যাচ্ছে, সব বুঝিয়ে যাচ্ছে। এক এক করে আমার চোখে ভেসে উঠছে মিস এ বি সি ডি-দের মুখ। ওরা সব নর্তকী। ওরা নাচে। পার্ক স্ট্রিটের সব রেস্তোরাঁয় বছর ভোর নাচ হয় না। দু-একটি

ব্যতিক্রম। বাকি সব জায়গায় চব্বিশ ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি বসে ক্যাবারের আসর ডিনারের সময়। নর্তকীদের ঘুঙুর বাঁধা প্রতিদিন কলকাতার বড় হোটেলে। গ্র্যানড, পার্ক, রিজ, গ্রেট ইসটারন আর হোটেল হিন্দুস্তানে। ওরা নাচে আর নাচায়। বিল ওঠে চড়চড় করে। ব্যানড-লিডার মাউথ-পিস ধরে অ্যানাউনস করে, লেডিস অ্যানড জেনটলমেন, উই নাউ প্রেজেনট য়্যু মিস চাঁচাছোলা। মিস চাঁচাছোলা ইন বুস।

আলোগুলো সব ঝপ করে নিভে যায়। চারধার থেকে চারটে ফোকাসিং ল্যাম্প জ্বলে ওঠে। কাঠ বা কাঁচের ফ্লোরে কিলবিল করে ওঠে লাল নীল হলুদ সবুজ আলোগুলো। বুস হচ্ছে স্ট্রিপটিজ। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে ফ্লোরে নামেন নর্তকী। ব্যানডসম্যানেরা সপ্তমে সুর তোলে। নর্তকী প্রতিটি টেবিল ঘুরে ঘুরে পরিচয় সারেন খদ্দেরদের সঙ্গে। এটা একটা কমন এটিকেট। কনভেনশন। হ্যানডশেক শেষে ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়ান নর্তকী। লাল নীল হলুদ সবুজ আলোগুলো তখন গিলতে থাকে মিস চাঁচাছোলার শরীর। মাথার টুপি, হাতের দস্তানা টুপটাপ খসে পড়ে শরীর থেকে। নাচ চলছেই। এক সময় সারা শরীর ঢাকা পরিধেয়টির চেনটিও খুলিয়ে নেন নর্তকী কোনও এক খদ্দেরকে দিয়ে। ধীরে ধীরে খেলিয়ে খেলিয়ে খোলেন সেটি। নাচ চলছে। শরীরে এখন দুটি বন্ধনী শুধু। একটি বুকে একটি কোমরে। একসময় বুকের বন্ধনীটুকুও খুলে ফেলেন। বুকে তখন একটি মাত্র সুতো। বাজনা দ্রুতলয়ে চলতে থাকে। উত্তেজিত মানুষগুলো মেরুদণ্ড খাড়া করে বাঁকা করে এর বগল ওর কান তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে মিস চাঁচাছোলার সৌন্দর্য গিলতে থাকে আদেখলার মতো। নর্তকী ততক্ষণ চরম মুহূর্তটির আগে তাতিয়ে তুলেছেন সকলকে। বাজনা বাজছে চড়া সুরে। প্লেটে মুরগীর ঠ্যাংটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কখন। খানাপিনা এ সময় শিকেয় তোলা। নর্তকী ঘুরে ঘুরে নাচছেন। এবার সেই সময়। পটাং করে খুলে ফেললেন কোমরের বন্ধনীটিও। আলো ঠিক তখনই ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে। দুটি সুতো শরীরকে আঁকড়িয়ে তখন। চামড়ার রঙের রং মিলে যায়। দশ হাত দূর থেকে মনে হয় যেন উদোম অপ্সরী ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। ঝপ করে আবার আলো জ্বলে যায়। ফ্লোর ফাঁকা। ব্যানডসম্যানরা শুধু নাচের রেশটি ধরে রেখেছে তাদের বাজনায়।

পিটার বলল : নর্তকীরা সবাই কনট্রাকট বেসিসে কাজ করেন। কেউ দেড়, কেউ দুহাজারী। আসে, নাচে, তাতিয়ে তুতিয়ে চলে যায়।

ব্যানডসম্যানদের দিকে নজর দিই। কেমন তালে তালে বাজিয়ে চলে ওরা। চোখগুলো নিস্পন্দ। কোনও বিহ্বলতা নেই, কোনও আগ্রহ নেই, নেই কোনও বিকার। নর্তকীদের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ওরা হদ্দ হয়ে গেছে। আর ভাল্লাগে না। কাঁহাতক আর এক জিনিস রোজ রোজ ভাল লাগে?

ম্যানেজার মালিকও সেটা বোঝে। হাজার হলেও রেগুলার খদ্দের তো তাদেরও আছে। তাই মুখ পালটাতে হয়। মাস কয়েক পরে আসে নতুন নর্তকী, নতুন গায়ক-গায়িকা। নতুন ঢঙে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। নতুন চোখ আর কান নিয়ে ভিড় করে পুরোনো খদ্দেররা।

পিটার বলল : নাচিয়ে গাইয়েদের তো রমরমাই। খালি কষ্ট হয় ব্যানডসম্যানদের দেখে। কতই বা পায় ওরা? মাসে দেড় দু'শ থেকে পাঁচ ছ'শ পর্যন্ত ম্যাকসিমাম। গ্র্যানড ফ্যানডের কথা অবশ্য আলাদা। পার্ক স্ট্রিটে ব্যানডসম্যানরা শোষিতই বটে। অথচ ওরাই খদ্দের টানে। হয়ত এটাই নিয়ম। রাজমিস্ত্রি বাড়ি তৈরি করে, থাকে রাজা।



অথচ ওদের থেকে ঢের বেশি রোজগার বেয়ারাদের। মাইনের দেড় দু'শ টাকায় ওদের মাসের রেশনটা ওঠে আর সংসারটা চলে টিপসের পয়সায়। বড় আজব এই দুনিয়াটা। পরিবেশন করেই দিন গেলে পকেটে ঝনঝন করে নাচে পঞ্চাশ একশ টাকা। সে টাকাতে ওরা দায়িত্ব পালন করে। ব্যানডসম্যানদের অতীত আছে, আছে বর্তমানও। শুধু ভবিষ্যৎ বলেই কিছু নেই। খুব আউটসট্যানডিং এবং ড্যাশিপুশি না হলে গাইয়েরাও বার হোটেলের এই গাণ্ডী ছেড়ে বেরোতে পারে না।

দেবাশিস পার্ক স্ট্রিটে রফির গান গায়। আমায় বলল : বন্ধু, একদিন বাড়ি এস। তোমায় গান শোনাব। রফিজীর গজল। আমি গাইব মনের মতো করে। তুমি থাকবে একমাত্র শ্রোতা। এখানে গাইতে সত্যিই ভাল্লাগে না। কেউই এখানে গান শোনে না ফ্রেনড। অনুরোধ করে স্লিপ পাঠায়। না গাইলে সময় সময় চিল্লামিল্লি করে। গাইলে শোনে গোড়াটা আর শেষটা। শেষ হলে হাততালি দিয়ে সাবাশি জানায়। গানের ওরা কিস্যু বোঝে না, কিস্যু জানে না। তবু গাইতে হয়। গাই চর্চাটা রাখতে আর রোজগার করতে। গানই নেশা, গানই পেশা। দু' পাঁচশ যা হয় নিজেরটা তাতে চলেই যায়। কখনও বাইরে ফাংশন করি। পয়সা তো দরকার?

দেবাশিসরা স্বপ্ন দেখে রঙীন ভবিষ্যতের। একদিন আরও বড় হবে। ঘরে ঘরে নাম হবে। রেকরড হবে। ফিল্মে গাইবে। রফিজী, কিশোরজীর সঙ্গে ছবি থাকবে। আর…। দেবাশিসরা টেবিলে ছোট্ট চাপড় মেরে উঠে যায়। পনের মিনিটের বিরতি শেষ। আবার ধরতে হবে অনুরোধের গান।

মাঝের একটা টেবিলে ছ'-সাতটা ছেলে-মেয়ে হুল্লোড় করছে। রাত এখন অনেক। তবুও নতুন করে অরডার দিচ্ছে সব। অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে সব। পিটার বলে, এরাই খরচ করনেওয়ালা পারটি। মা-বাবাদের প্রচুর আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা-বাবারা আসর জমায় বাড়িতে আর এরা আসে এদিকে। একটা সময় ছিল, পারক স্ট্রিটে যখন সিলেকটেড কাসটমার আসত। এমন দঙ্গল দেখলেই এখন ভয় করে। এখন এখানে গিজগিজ করে হাড়হাভাতের দল। খেয়ে দেয়ে কাঁটাচামচ মায় পেগের গেলাস পর্যন্ত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে হাওয়া হয়। গুড উইল নষ্ট হওয়ার ভয়ে সব বুঝেও চুপচাপ থাকি। বেশি কিছু বললে ঘুঁষি খেতে হবে। টুংটাং ভাঙচুর হবে। তার থেকে যা বাবা বিদেয় হ। আটকে রেখে থানায় ফোন

কমলেও বিপত্তি। দুদিন পর রাস্তায় ধরার জন্যে দলবল নিয়ে যে ওৎ পেতে থাকবে না তার কোনও গ্যারানটি আছে কি ?

সিলেকটেড, পালিশড ক্রাউডরা এখন তাই বড় হোটেলে যায়। গ্র্যানড, পার্ক, গ্রেট ইসটারন, রিজ, হোটেল হিন্দুস্তানে ভিড় করে। ওখানে পয়সা লাগে আরও বেশি। এই যেমন গ্রেট ইসটারনে টেবিলের ওপর লেখাই আছে তিরিশ টাকার নিচে বিল হবে না। অর্থাৎ দুজনে যেতে গেলে মিনিমাম ষাট টাকা। তার ওপর থারটি পারসেনট এনটারটেনমেনট ট্যাকস প্লাস সারচারজ। সব কিছু মিলিয়ে শ' টাকার ধাক্কা। অথচ ওটা সরকারী হোটেল। আর খাওয়া যে পরিমাণ দেবে তাতে পেটের ওয়ান ফোর্থও ভরে না। তবুও কিছু লোক এই বড় হোটেলগুলোতেই যায়। দু' পয়সা বেশি দেব। সুখও হবে শান্তিও হবে। স্বস্তিটাই তো বড়।

॥ ৫ ॥

হাড়হাভাতে মাতালরা তবে কোথায় যাবে ?

জায়গা ? জায়গার অভাবে নেই এ কলকাতায় ওদের জন্যে। দুয়ার খোলা পাড়ায় পাড়ায়, খালাসীটোলায়, বারদুয়ারির।

বারদুয়ারি ? সেটা কি ?

কলকাতার এমন কোনও মাতাল নেই যে বারদুয়ারি চেনে না। এমন কোনও রিকসাওলা নেই, ঠেলাওলা নেই, ট্যাকসিওলা নেই যে বারদুয়ারি চেনে না। ঠিক লেনিন সরণীর কোল ঘেঁষে বসে প্রতিদিনই হেলে হেলে ঢলে পড়ে সারা গায়ে ক্রীম, স্নো, সেনট, তেলের বিজ্ঞাপন মাখা বারদুয়ারি। এককালে বারটা দরজা ছিল। এখন আছে একটি। বাদবাকি দরজাগুলো সব জানলা হয়ে গেছে।

আলুকাবালাওয়ালাকে পাশ কাটিয়ে তেল-চিটচিটে পর্দাটা সরিয়ে ঢুকে পড়লেই দিশী মদের ঝাঁঝালো গন্ধে নাক কোঁচকাতে হয়। সারি সারি মাথা, রাশি রাশি বোতল। কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে কেউ দেখে না। শুধু তাকায়। তবে ও চোখে ঠাওর হয় না। ও চোখ তখন দোলে। দোলে আর দোলে। গরিবগুর্বোদের চোখ। ঠেলাওলা, রিকশাওলা, আনাজওলা, সবজীওলা, দোকানওলার চোখ। বেশিরভাগই গরিব দেহাতি। সারা দিনে দশ টাকা আয়, তারই কিছু ফুর্তিতে যায়। ফুর্তি নয়, ওটা ওদের সঞ্জীবনী সুধা।

পরিষ্কার চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কিছু উজ্জ্বল মুখ। এখানে আসেন ওরা। দেখা মেলে উঠতি কবি, পড়তি কবি, হতাশ সাহিত্যিক, ব্যর্থ চলচ্চিত্রকারের। বারদুয়ারির নেশাটাই ভিন্ন জাতের। বারদুয়ারি কলকাতার দিশী মদের বৃহত্তম বার।

একটু এগিয়ে লোটাস সিনেমার কাছে খালাসীটোলা। ওখানেও একই জীবন। দুটোই নারীবর্জিত। ঝাঁঝালো মদের টানে দুটোতেই ভিড় ওপছায় মাঝরাত পর্যন্ত। অনেক দূরে, বহুদূরে আছে খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ। সেখানে আট আনায় মদ মেলে এক টাকায় লক্ষ ধরা মেয়েমানুষ। ওখানে ঝাঁপ সারারাত খোলা সন্ধ্যে থেকে ভোর। কচুরিপানা ভরা গাঙের জোয়ার।

কলকাতার হৃদপিণ্ডে মাঝরাতে বারদুয়ারি, খালাসীটোলার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবার পরও মদ মেলে ঘোপায় ঘোপায়। মিশন রোর পাশে বন্দুকের গলি আছে। ছোট্ট খুপরিতে টোকা মেরে দোকানীকে ডাকতে হয়। ঘুম চোখে বোতল সাপ্লাই করে সে। খাবার জায়গা নেই। সামনের প্রায় পোড়ো বাড়ির দোতলার ঝুল বারান্দায় মই লাগিয়ে উঠতে হয়। মই মানে নড়বড়ে সিঁড়ি। সেখানেই আসর বসে। দোকানী পাঠায় অণ্ডকোষ আর ফুসফুস ভেজে দিয়ে যায়। চমৎকার চাট। অমৃত অমৃত ঠেকে মাতালের জিভে।

॥ ৬ ॥

রাত বাড়ে। গভীর রাত। এক সময় সারা কলকাতার হোটেল আর বারে লাসট পেগ সার্ভড হয়। নো মোর ড্রিংকস, নো মোর এনজয়মেনট। বড় হিসেব করে গলায় ঢালতে হয় শেষ পেগটি। গানবাজনা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। নর্তকীও চলে গেছে তার সুখের নীড়ে। নিরালা হোটেলের নিভৃত কোণে নিঃসঙ্গ বেয়ারা নিঃশব্দে হাই তোলে। বড় হোটেলের ইন্টিরিয়ালে অপেক্ষারত লোকটি সাদা তোয়ালে পরিপাটি গুছিয়ে রাখে। চিরুনীটি ঠিক জায়গায় রেখে সোজা হয়ে বসে। বাবুরা বিবিরা আসবে মুখে চোখে জল দিতে। ঠিক সময় তোয়ালে এগিয়ে দিতে হবে। সেলামও ঠুকবে একটা জোরসে। সেলামী ? সব্বাই চলে গেলে চোগা চাপকান ছেড়ে পকেট হাতড়াবে। দিনান্তে কত হল ?

পিটারদের এসময় অখণ্ড অবসর। তাই অবসাদ আসে। এক ফাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে মনের সুখে একটা সিগারেট ধরায়। আঃ। কী আরাম। একটা দিন গেল।

ম্যানেজার ক্যাশ মিলিয়ে, সব ঠিকঠাক রেখে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলের জন্য হাঁক পাড়ে। ড্রাইভারটা প্রায় দিনই ঘুমিয়ে পড়ে এসময়। ঠেলে তুলে বাড়ি ছুটতে হবে। ভগবান, নিশাচরদের থেকে কতটা কোথায় ?

সুখ আর খুশির টানে ঘরছাড়া লোক-গুলোর এবার ঘরে ফেরার পালা। সঙ্গিনী সঙ্গীর কোমর ধরে ধীরে ধীরে পা ফেলে। আকণ্ঠ মজে যাওয়া লোকগুলোর জন্যে রাত-ভিরেতেও সার সার জড়ো থাকে লাল শালু জড়ানো ট্যাকসি। এবার ওদের দাঁও মারার সময়। বড়লোকের ব্যাটাবেটি নিজের গাড়িতে উঠে পড়ে। বাকিরা করে ট্যাকসির সঙ্গে রফা। সারা শরীরে দারিদ্র্য মাখা কিছু লোক ঘুরঘুর করে। উচ্ছিষ্টগুলি এবার ঝপাঝপ বাইরে পড়বে। মধুর লোভে জড় হয় পিঁপড়েরা। হায় সাব' সুইট সিকসটিন হ্যায়, হিন্দি হ্যায়, আংরেজি হ্যায়। কেউ কেউ কৌতূহল দেখায়। রাতটা না হয় ওখানেই কাটাই। কেউ কেউ পাশ কাটায় বিরক্তি ছুঁড়ে। রিকসাওলারা ক্রমাগত ঠুংঠাং আওয়াজ বাজায়। মাতালের মতিগতি বোঝা ভার। কখন চেগে উঠবে ঠিক কি ?

পিটাররা হাত নেড়ে বিদায় নেয়। বেশ চলেছে সব। রাস্তা না তো, যেন পেল্লাই পেল্লাই শোল মাছ শুয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে পা হড়কে হাঁটছে কেমন ! পিছলে যাচ্ছে গাড়ির চাকা। হুস হুস করে ছুটছে সব।

বড় রাস্তায় এখন পাতালে রেলের কবর খোঁড়া। হে নাঙ্গা ফকির, কতদিন এই পারক স্ট্রিটের মোড়ে পা বাড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলে মনে আছে ? কতদিন ধরে পারক স্ট্রিটের রং রস রূপ উপভোগ করেছ ? তুমি চেয়েছিলে না হৃষ্টপুষ্ট গ্রাম ? বলেছিলে না সত্যাই হবে জীবনের আদর্শ ? কী দেখেছ এতদিন ? ক্যালকাটা বাই নাইট ? কলকাতার হৃদপিণ্ডে থেকে থেকে বুঝেছ তো যা বলেছ ভুল বলেছ, জীবনে যা কিছু মহান ভেবেছিলে সব কিছু সত্য হয় না ? কে বলে তোমার দেশ গরিব ? কোন মূর্খ সে ? কী তার নাম ? দেখ কত পয়সা উড়ল পুড়ল। কত পয়সা ওড়ে পোড়ে প্রতিদিন। জীবন কত স্বাস্থ্যবান, জীবন কত লোভনীয়। ওই মেয়ো রোডে গিয়ে বেঁচে গেছ তুমি বাপুজী। থাক, ওখানেই থাক। ওখানে ওই মেয়ো রোডের চারিদিকে সবুজ ঘাস আছে, গাছ আছে। মাটি ভিজলে ওখানে সোঁদা গন্ধ বাতাসে ভাসে। ওখানেই থাক। কলকাতা ওখানে গ্রাম গ্রাম সেজে থাকে। বর্ষায় গাছের ওপর ঝমঝমে বৃষ্টি নামে। টুপটাপ জল পড়ার শব্দ শোনা যায়। সেই ফাঁকে একটু কেঁদে নিও বাপুজী। পাতাল রেল একদিন কলকাতার পেটে ঢুঁ মারবে। কলকাতার হোটেল বার রেস্তোরাঁর সন্ধ্যার জীবনও বয়ে যাবে বিরামহীন। দোহাই, কলকাতায় যদি থাকতেই হয় তাহলে মেয়ো রোডেই থেকো। পাশ্চিমী হাওয়ায় দোলা লাগা হোটেল বারের কেন্দ্রভূমি এই পারক স্ট্রিটের সাক্ষী হয়ে ফের পাহারাদার সেজ না। ★

আমেরিকায় নয়, আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে প্রথম ধর্মঘট হয়েছিল অসট্রেলিয়ায়

সুবীর ভট্টাচার্য

মে মাসের প্রথম দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে আজকের পৃথিবীতে সুচিহ্নিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো দিনটাকেই শ্রমিকের কাজের সময় বলে গণ্য করা হতো। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মনে প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সেই প্রতিবাদ রক্ত-ঝরা বিস্ফোরণের চেহারা নিয়েছিল আমেরিকায়—১৮৮৬ সালে। ১৮৮৪ সালের ৭ অকটোবর আমেরিকার এক তরুণ সংগঠন—আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার—প্রস্তাব নিল : ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে দৈনিক আট ঘণ্টাকেই কাজের সময় বলে আইনত গণ্য করতে হবে। আট ঘণ্টা কাজের দিন বেঁধে দেবার দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দেন। ধর্মঘটের মূল কেন্দ্র ছিল শিকাগো : কিন্তু নিউ ইয়রক, বালটিমোর, ওয়াশিংটন, মিলওয়াকী, সিনসিনাটি, সেন্টলুই, পিটসবুর্গ প্রভৃতি শহরেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মঘটের শুরু ১ মে। ২ মে ছিল রবিবার। মে মাসের ৩ তারিখ থেকে ধর্মঘট ছড়াতে শুরু করে। সে দিন ম্যাককরমিক ফসল কাটার কারখানায় মালিকের ভাড়া করা লোকজন এবং পুলিশের আক্রমণে ৬ জন শ্রমিক নিহত হন, আহত হন অসংখ্য। ধর্মঘটী শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে পরের দিন সন্ধ্যায় শিকাগোর 'হে মারকেটে' সভা ডাকা হয়। সভা চলার সময় অকস্মাৎ সেখানে একটি বোমা ফাটে—৭ জন পুলিশ ও ৪ জন শ্রমিক নিহত হন। পুলিশ শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করে। পরের বছর ১১ নভেমবর পারসনস, স্পাইস, ফিসার ও এনজেলকে ফাঁসি দেওয়া হয় : গীর, সোয়াব ও ফিলডেনকে দীর্ঘ মেয়াদী সাজা দেওয়া হয়।

আমেরিকার শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে পৃথিবীতে প্রথম সুসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন বলে মনে করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে ১ মে তারিখের ভূমিকার সঙ্গে হে মারকেটের ঘটনা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। কিন্তু ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট কি আমেরিকাতেই প্রথম হয়েছিল? উত্তর কিন্তু নেতিবাচক।

এই নেতিবাচক উত্তরের উৎস আন্তর্জাতিক কমিউনিসট আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী রোজা লুকসেমবুর্গের একটি লেখা। ১৮৭১ সালে পোলানডের এক ইহুদী পরিবারে রোজার জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে জারমানিকেই কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন।

রোজা ছিলেন লেনিনের সমবয়সী এবং তার সঙ্গে রোজার বন্ধুত্বও ছিল গভীর। কিন্তু জাতীয় স্তরে কমিউনিসট আন্দোলন, পারটি সংগ্রামের প্রকৃতি, বিপ্লবের পদ্ধতি ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে পরবর্তীকালে লেনিনের সঙ্গে রোজার তুমুল তর্কবিতর্ক হয়। ফলে 'প্রাতিষ্ঠানিক' কমিউনিসটদের কাছে রোজা ছিলেন 'সিফিলিসের জীবাণু'র মত মারাত্মক।

১৯১৯ সালে রোজা জারমান সরকারের হাতে বন্দী হন এবং সেই অবস্থায়ই গোপনে নৃশংস ভাবে তাকে খুন করে মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তার বহু রচনাই ইংরাজিতে অনূদিত হয়নি : তবে 'অ্যাকুমুলেশন অব ক্যাপিটাল' সহ কয়েকটির ইংরেজি ভাষান্তরণ পাওয়া যায়।

নিউ ইয়রক থেকে প্রকাশিত হয় বামপন্থী



হে মারকেটে প্রথম মে দিবসে শ্রমিক সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে মালিকদের ভয়াবহ অত্যাচার নেমে আসে



রোজা লুকসেমবুর্গ

পয়লা মে-র উদ্ভব

রোজা লুকসেমবুর্গ

আট ঘণ্টা কাজের সময়সীমা দাবি করার জন্য সর্বহারাদের সেই উদ্দীপক ছুটির দিন প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল অসট্রেলিয়ায়। ১৮৫৬ সালের প্রথম দিকে শ্রমিকরা একদিনের সমস্ত কাজ বন্ধ রাখার আহ্বান জানালেন, তারা ভাবলেন দিনটি তারা সভাসমিতি ও আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দেবেন, এই হবে আট ঘণ্টা কাজের দিনের দাবিতে তাদের বিক্ষোভের ধরন। ২১ এপ্রিলকে এই পরিকল্পিত ছুটির দিন হিসাবে বেছে নেবার কথা চিন্তা করা হল। শুরুতে অসট্রেলিয়ার শ্রমিকরা ১৮৫৬ সালে একবারই ঐ ছুটির দিন পালনের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু প্রথম অনুষ্ঠানই এমন বিরাট প্রভাব ফেলল যে অসট্রেলিয়ার নিপীড়িত জনগণ প্রত্যেক বছর ঐ বিশেষ দিনকৈ বার্ষিক ছুটির দিন হিসাবে পালনের কথা ভাবলেন।

বস্তুত, নিজেদের কাজ থামিয়ে রাখার, আত্মশৌর্যসম্পন্ন শ্রমজীবী জনগণকে আরও বড় শক্তি ও বিশ্বাস যোগাবার মত বিষয় আর কি আছে? বাহিনীশুদ্ধ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মত কারখানা ও কর্মক্ষেত্রের চিরন্তন ক্রীতদাসদের বীরত্ব আর কি আছে? ফলে সর্বহারাদের ছুটির দিনের ধারণা অতি সহজে স্বীকৃতি পেল এবং তা অসট্রেলিয়া থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সমস্ত শ্রমজীবী দুনিয়ার হৃদয় জয় করে নিল।

অসট্রেলিয় শ্রমিকদের এই উদাহরণ প্রথম অনুসরণ করে আমেরিকানরা। ১৮৮৬ সালের পয়লা মে-কে তারা সাধারণ কাজ বন্ধের দিন হিসাবে পালনের কথা ভাবলেন। ঐ দিন দু লক্ষ শ্রমিক কাজ থেকে বিরত থাকলেন এবং আট ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি তুললেন। পরে সরকারি অত্যাচারের ফলে কয়েক বছরের জন্য এই বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ রাখলেন। যাই হোক, ১৮৮৮ সালে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নতুন করে ঘোষণা করলেন ১৮৯০ সালের পয়লা মে-কে তাদের পরবর্তী ছুটির দিন হিসাবে পালনের কথা ভাবলেন।

ইতিমধ্যে, ইওরোপে শ্রম-আন্দোলন দুর্বার হয়েছে এবং নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে। ১৮৮৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে এই অভ্যুত্থানের পূর্ণাঙ্গ চেহারা দেখা গেল। সম্মেলনে উপস্থিত ৪ হাজার প্রতিনিধি মূলত আট ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা রাখলেন। ফরাসি ট্রেড ইউনিয়ন-প্রতিনিধি বোরদু থেকে আগত লেভিনে সারা পৃথিবীতে সমস্ত শ্রমিকদের ছুটির দিন ঘোষণার দাবি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আনেন। এরপর যখন আমেরিকান শ্রমিকদের প্রতিনিধি ১৮৯০ সালের পয়লা মে-র ব্যাপারে তার কমরেডদের সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন সম্মেলন সেই দিনটিকেই আন্তর্জাতিক ছুটির হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রকৃতপক্ষে তিরিশ বছর আগে অসট্রেলিয় শ্রমিকদের মতই এক্ষেত্রেও একবারই বিক্ষোভ সমাবেশের কথা ভাবা হয়েছিল। সম্মেলন সিদ্ধান্ত নেয় সমস্ত দেশের শ্রমিকরা ১৮৯০ সালের পয়লা মে আট-ঘণ্টা কাজের দিনের দাবিতে এক সঙ্গে বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন। অন্য কেউ আগামী বছরগুলিতে এমন কোন বিকল্প ছুটির দিনের কথা তোলেননি। অবশ্য কেউ ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারেননি কেমন করে এই প্রস্তাব সার্থক হবে এবং কত তাড়াতাড়ি শ্রমিকরা এর বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ১৮৯০ সালে মে-দিবস একবারই পালনের প্রস্তাবই ছিল যথেষ্ট কেননা মুহূর্তমাত্রে সকলে বুঝেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন মে-দিবসের অনুষ্ঠান হবে চিরস্থায়ী, বাৎসরিক উদযাপন।

পয়লা মে আট ঘণ্টা কাজের দিনের শ্লোগান তুলেছে। কিন্তু এই দাবি মিটলেও পয়লা মে উদ্‌যাপন শেষ হবে না। যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম চলবে, যতদিন না সমস্ত দাবি মিটছে, মে দিবসের ছুটি উদ্‌যাপন হবে সেই সব দাবি জানানোর বাৎসরিক বিক্ষোভ-স্ফুরণ। এমন কি যদি সেই নবপ্রভাত আসেও, সমস্ত দুনিয়া জুড়ে যদি শ্রমজীবী শ্রেণী তাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে, তাহলে তখনও হয়ত যে সংগ্রাম ঘটে গেছে, যে দুঃখরাতি যাপিত হয়েছে তারই স্মৃতিতে পয়লা মে উদ্‌যাপন করে যাবে ভবিষ্যমানবতা।

[প্রবন্ধটি এই প্রথম বাংলায় অনূদিত হল। ইংরাজি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ইনটারন্যাশনাল সোসালিস্ট রিভিউ পত্রিকার ১৯৭১, মে মাসের সংখ্যায়। ভারতীয় কোন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে বলে শোনা যায়নি।]

অনুবাদ: যীশু চৌধুরী

মাসিক পত্রিকা 'ইনটারন্যাশনাল সোসালিসট রিভিউ'। সম্পাদক ল্যারি সেগল। ঐ পত্রিকার ১৯৭১ সালের মে সংখ্যায় রোজা লুকসেমবুর্গের একটি লেখার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটির নাম The Origins of May Day. ঐ লেখায় রোজা জানিয়েছেন—আমেরিকার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ৩০ বছর আগেই অসট্রেলিয়ার শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিলেন। 'The inspired thought of introducing a proletarian holiday as a means of obtaining the eight-hour working day first originated in Australia. As early as in the year 1856, the workers there resolved to call for one day of complete work stoppage ...'

এ সম্পর্কে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হল—অসট্রেলিয়ার ধর্মঘটের মাত্র ৬ বছর পর—১৮৬২ সালে—একই দাবিতে ধর্মঘট হয়েছিল ভারতেই। রোজা লুকসেমবুর্গের লেখায় অবশ্য তার উল্লেখ নেই। 'ভারতে মে দিবস' পুস্তিকায় গোপাল ঘোষ লিখেছেন : বিশ্বে যখন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটের কোন নজীর পাওয়া যায়নি, সে সময় ১৮৬২ সালে হাওড়ার রেলওয়ে শ্রমিকেরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিলেন। এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১১০০ শ্রমিক। এই ধর্মঘট সফল হয়েছিল কিনা সে খবর ইতিহাসের পাতায় না থাকলেও তৎকালীন সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ' ধর্মঘটের সমর্থন জানিয়েছিলেন'। (দিলীপ বসু রচিত 'মে-দিবসের ইতিহাস' বইতে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩২।)

মে দিবসের উদ্ভব প্রবন্ধে রোজা লুকসেমবুর্গ বলেছেন : ৮ ঘণ্টা কাজের দিন—এই দাবি আদায় করবার উপায় হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের বছরে একটি ছুটির দিন, অর্থাৎ কর্ম বিরতির দিন পালনের প্রেরণাসঞ্চারী পরিকল্পনার প্রথম রূপকার অসট্রেলিয়ান শ্রমিকরা। এই উদ্দেশ্যে তারা ১৮৫৬ সালের ২১ এপ্রিল তারিখটি ধার্য করেছিলেন। ঠিক হয়—এই দিন তারা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন এবং সভা করে তাদের দাবি উত্থাপন করবেন। পরিকল্পনামত পালিত হল ২১ এপ্রিল তারিখে কর্মবিরতির কার্যসূচী। এই আন্দোলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকরা বছরের একটি বিশেষ দিনে এই কর্মবিরতির কর্মসূচি পুনরাবৃত্তির কথা চিন্তা করলেন।

'স্বেচ্ছায় কর্মবিরতি করার মধ্যে যে সাহস এবং আত্মবিশ্বাস আছে—আর কোন কিছুর মধ্যে তা কি দেখা যায়? কারখানার চিরকালের দাসদের (eternal slaves of the factories) নিজেদের উপর নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করবার ঘটনা তাদের যে সাহস জোগায় আর কিছু কি তেমন ভাবে সাহস দিতে পারে? এই কারণেই প্রলেতারিয় ছুটির ধারণা খুব দ্রুত সমর্থিত হল এবং অসট্রেলিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়লো অন্যান্য দেশে। সমগ্র প্রলেতারিয়দের নিজেদের দিকে না টানা পর্যন্ত এই চিন্তা প্রসারিত হয়েই চলবে।'

'অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের প্রথম অনুসরণ করলেন আমেরিকান শ্রমিকরা। ('First to follow the example of the Australian workers were the Americans.') ১৮৮৬ সালের ১ মে তারা কর্মবিরতির পরিকল্পনা নিলেন।...'

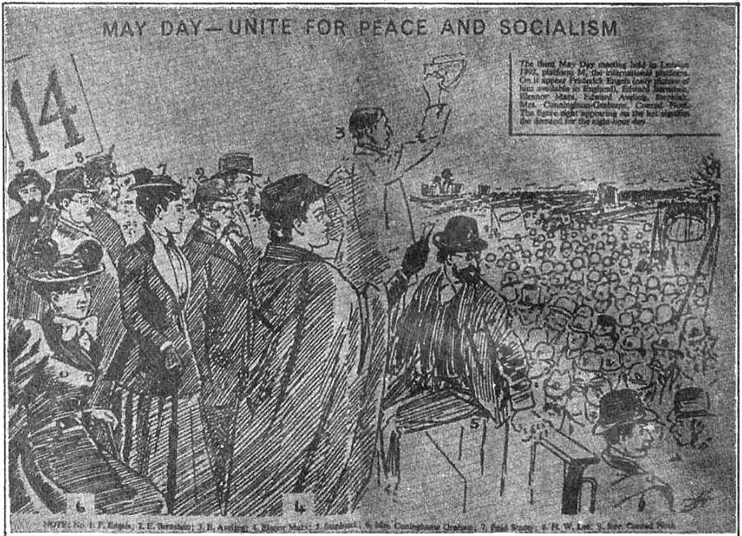
রোজা লুকসেমবুর্গ তার প্রবন্ধে অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে বছরের বিশেষ একটি দিনে ধর্মঘটের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা এতো সুস্পষ্টভাবে এই তথ্য জানতে পারিনি। কার্ল মার্কস থেকে উইলিয়ম জেড, ফসটার, আলেকজান্ডার ট্রাকটেনবার্গ থেকে রিচার্ড ও বয়্যার এবং হাবার্ট এম মোরেস, কেউ-ই কিন্তু অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের এই সংগ্রামকে পথিকৃতের মর্যাদা দেননি। অবশ্য ট্রাকটেনবার্গ তার ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান জগদ্বিখ্যাত 'মে-দিবসের ইতিহাস'-এ বলেছেন—'কাজের ঘণ্টা কমানোর এই আন্দোলন একমাত্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই হয়েছিল, তা নয়; উদীয়মান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেখানেই শ্রমিকেরা শোষিত হচ্ছিলেন সেখানেই এই আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। তাই দেখা যায় অসট্রেলিয়ার মত সুদূর দেশের গৃহ-নির্মাণ শ্রমিকরাও আওয়াজ তুলেছিলেন—'আট ঘণ্টার কাজ, আট ঘণ্টা আমোদ-প্রমোদ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম।' এই দাবি আদায় করতে তারা সক্ষমও হয়েছিলেন।'

ট্রাকটেনবার্গের উদ্ধৃতিটি আলতোভাবে পড়লে মনে হবে : অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের ২১ এপ্রিল ১৮৫৬ গৌরবমণ্ডিত ধর্মঘটকে তিনি উপেক্ষা করেননি। কিন্তু তারপরেই তিনি তার ঐ বিখ্যাত ইতিহাসে লিখলেন : 'যে সমস্ত সংগ্রাম মে দিবসের জন্মের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত, তার সূচনা হয় ১৮৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আট ঘণ্টা কাজের দিনের আন্দোলনের মধ্যে।' এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় 'সরাসরিভাবে জড়িত' শব্দ দুটি। আমাদের প্রশ্ন—আট ঘণ্টার কাজের দিনের দাবির লড়াই থেকেই যদি মে দিবসের উদ্ভব হয়, তবে অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রাম উপেক্ষিত হবে কেন? হে-মার্কেটের ঘটনা হচ্ছে আট ঘণ্টার সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াজাত।

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কাজের দিন কমানোর লড়াই, মজুরি বাড়াবার লড়াই আর আট ঘণ্টার কাজের দিনের দাবির লড়াই-এর পার্থক্য কী? পার্থক্য আছে বলেই রোজা লুকসেমবুর্গের প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্যটি আমাদের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে। পার্থক্যটা কী? এ বিষয়ে যা কিছু বক্তব্য তা কার্ল মার্কসের জবানিতেই পেশ করতে চাই। মার্কস তার 'ক্যাপিট্যাল'-এর প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায় জুড়ে 'কাজের দিন' বিষয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন 'আট ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি বৈপ্লবিক তাৎপর্যমণ্ডিত। শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বে এই দাবি খুবই সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠলে মালিকদের বিপদে, আর এই দাবি আদায় করতে না পারলে শ্রমিকদের মুক্তির পূর্ণ আন্দোলন বিকশিত হতে বাধা পাবে।

মার্কস লিখছেন : 'কাজের দিনকে (Working Day) তার স্বাভাবিক উচ্চতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করতে এবং তার পরে তার সীমা ছাড়িয়ে তাকে স্বাভাবিক দিনের বারো ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে ধনতন্ত্রের কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল; কিন্তু এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মেশিননির্ভর ও আধুনিক শিল্পের (birth of machinism and modern industry) প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো এক বিরাট আক্রমণ—যার একমাত্র তুলনা চলে হিমবাহের সঙ্গে। নৈতিক ও প্রাকৃতিক বাধা ভেঙে গেল, বয়স বা পুরুষ ও নারীর পার্থক্য রইল না, দিন ও রাতে ভেদরেখা মিশে গেল। যে সব আইনে দিন ও রাতের সংজ্ঞা ছিল, সেগুলিও এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেল যে, আইনের দিক থেকে দিন ও রাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন ইংরেজ বিচারককে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল। এটা ১৮৬০ সালের কথা। ধনতন্ত্রের তাণ্ডবনৃত্য শুরু হল।'

এর বিরুদ্ধে ইংল্যানড, ফ্রানস এবং আমেরিকায় সংগ্রামও হয়েছে। এসব সংগ্রামের অগ্রগতিতে ১০ ঘণ্টার দাবি এসেছে, মজুরি বৃদ্ধির দাবি এসেছে। কিন্তু ১৮৬৬ সালে বালটিমোরের ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইনটারন্যাশনাল ওয়ারকিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনও বললেন, '৮ ঘণ্টাই কাজের দিনের আইন-সঙ্গত সীমা'। মার্কসের কথায়—'স্বাভাবিক কাজের দিনের স্বীকৃতি হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে একটি গৃহযুদ্ধের ফল'। এরপর তিনি ইংলনড এবং ফ্রানসের কথা আলোচনা করে আমেরিকার প্রসঙ্গে এসে বললেন—'উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যতদিন দেশের একটি অংশ ক্রীতদাস প্রথার দ্বারা কলঙ্কিত ছিল, ততদিন শ্রমিকদের প্রত্যেকটি পৃথক আন্দোলন দমিত হতো। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মুক্তি কখনোই সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। কিন্তু



১৮৮২ খৃস্টাব্দে ইংলনডে আহূত তৃতীয় মে দিবস সমাবেশ। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ঃ ১. ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস, ২. ই. বারনসটিন, ৩. অ্যাভেলিংগ, ৪. ইলিনর মার্কস, ৫. স্টেপিনাক ৬. শ্রীমতী ডানিংহাম গ্রাহাম, ৭. ইনিড স্টেচি, ৮. এইচ. ডবলু. লী, ৯. রেভারেনট কনরাড নোয়েল। ছবিটি লনডনের একটি শ্রমিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়

ক্রীতদাসত্ব প্রথার অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে দ্রুত জেগে উঠল নূতন জীবন। গৃহযুদ্ধের প্রথম ফসল (first fruit) ৮ ঘণ্টার জন্য আন্দোলন দুরন্ত গতিতে ধাবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো অতলান্তিকের উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, নিউ ইংলনড থেকে ক্যালিফোর্নিয়া'। ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবিতে ইতিমধ্যে আমেরিকার ৬০টি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বালটিমোরের অধিবেশনে, ১৬ অগাসট ১৮৬৬ সালে। এই অধিবেশন থেকেই সৃষ্টি হল ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের। মার্কস এই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং নিউ ইয়রকের ডানকারকের শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করলেন 'ক্যাপিট্যালে' এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একই বছরে প্রথম আন্তর্জাতিকের (ইণ্টার-ন্যাশনাল ওয়ারকিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন) জেনিভা কংগ্রেসের প্রস্তাবও উদ্ধৃত করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে : 'কাজের দিনকে সীমাবদ্ধ করাই হচ্ছে প্রাথমিক পূর্বশর্ত যা না হলে উন্নতি ও মুক্তি (improvement and emancipation) ব্যর্থ হতে বাধ্য··· কংগ্রেসের মতে তাই ৮ ঘণ্টাই কাজের দিনের আইনসঙ্গত সীমা'।

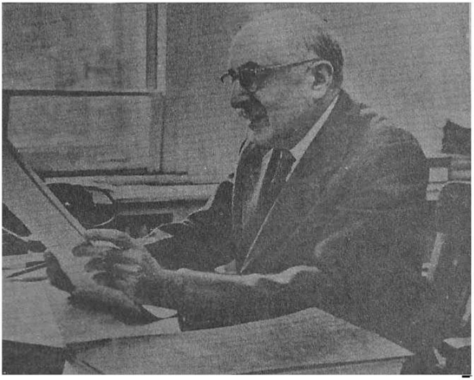
লক্ষ্য করবার বিষয়—মার্কস কিন্তু অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট সম্পর্কে নীরব। মার্কস কেন নীরব—এ প্রসঙ্গে প্রমাণসিদ্ধ কোনো সিদ্ধান্তে আসা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে, অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের সেই মহান ধর্মঘটের কথা হয়তো মার্কসের কাছে তখনো পৌঁছয়নি। নতুবা কার্ল মার্কসের পক্ষে এই ধর্মঘটকে অস্বীকৃতির কোনো কারণই পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার রোজা লুকসেমবুর্গের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'মে দিবসের উদ্ভব' প্রবন্ধে অসট্রেলিয়ার এই ধর্মঘটের সংবাদের কোন উৎসের কথা রোজা জানাননি। ইনটারন্যাশনাল সোসালিসট রিভিউ-র সম্পাদকও রোজার এই প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি—এই তথ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই জানাননি। সঙ্গত কারণেই প্রবন্ধটি কোন সময়ে রচিত, কোথায় প্রকাশিত এ সব প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিসট আন্দোলনের এই বিতর্কিত নেত্রী—কমিউ-নিসটদের প্রাতিষ্ঠানিক মহলের দ্বারা যেহেতু সমর্থিত নন, হয়তো বা সে কারণেই তার সম্বন্ধে জারমানির বাইরে আমরা খুবই কম জানি। আর তার রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয়ও সহজসাধ্য নয়। কারণ, ইংরেজি এখনো পর্যন্ত আমাদের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে জানবার প্রধান মাধ্যম। সুষ্ঠু ও পরিকল্পনা-মাফিকভাবে রোজার লেখার ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশ খুব বেশি দিনের নয়। একদা 'দক্ষিণপন্থী' পরে 'উগ্রপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত, লেনিনের সঙ্গে বিতর্ককারী এই নেত্রীর রচনাবলীও হয়তো তার নিজের মতই 'সিফিলিসের জীবাণু'র তুল্য ভয়ঙ্কর! যাই হোক, রোজা লুকসেমবুর্গের জীবনীকার পেটার নেটল্-এর (Peter Nettle) সাক্ষ্য অনুসারে এই রচনাটিকে রোজার প্রথম মুদ্রিত

সংকলন গ্রন্থ, পোলিশ ভাষায় লেখা First of May Celebration নামক সংকলনের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ বলে সনাক্ত করা চলে। সংকলনটি ১৮৯২ সালের ফেবরুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, ১৮৯১ সালের মে-দিবসের প্রাক্কালে অথবা এই বছরের শেষে বা ১৮৯২-এর প্রথম দিকে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। ১৮৯১-৯২ সালে রোজা লুকসেমবুর্গ যদি এই তথ্য জানতে পেরে থাকেন, তবে ইওরোপ ও আমেরিকাও জেনেছিল। আলেকজেনদার ট্রাকটেনবার্গ-এর 'মে-দিবসের ইতিহাস' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। আমাদের ধারণা, শ্রমিক আন্দোলনের মূল ধাঁটি থেকে সুদূরে অবস্থিতি এবং আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, তৎকালে শিল্পে অনুন্নত কৃষি ও পশুচারণ নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের সংবাদ ১৮৯০ সালের আগে ইওরোপ পায়নি। ১৮৯০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আহ্বানে সমস্ত পৃথিবীর নানা দেশে যখন প্রথম আন্তর্জাতিকের ডাকে মে-দিবস উদযাপিত হল, তারপর হয়তো কোন সূত্রে ইওরোপ এই সংবাদ পেয়েছিল। মার্কস এবং পরে এনগেলস-এর পক্ষে তাই এই সংবাদ জানা সম্ভব হয়নি।

মার্কস-এনগেলস জানতেন না, তাই অসট্রেলিয়ার ধর্মঘটের উল্লেখ করেননি। কিন্তু ট্রাকটেনবার্গ, ফসটার, বয়্যার ও মোরেইস—এরা এই সংগ্রামের যথাযথ মূল্যায়ন করে মর্যাদা দিতে কুন্ঠিত কেন? এ প্রশ্নের কিন্তু জবাব পাই না। অবশ্যই বলা দরকার রোজার একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে সামান্য একটি তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত নয়। আমরা এই সামান্য তথ্যটুকু সম্বল করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ইচ্ছুকও নই। কিন্তু The Accumulation of Capital যার লেখা, মার্কস এনগেলস-এর মূল রচনাবলীর সঙ্গে যার পরিচয় ঘনিষ্ঠ, যার বক্তব্যকে খণ্ডন করতে স্বয়ং লেনিনকে আসরে নামতে হয়েছিল, বার্নসটাইনের স্বরূপ উন্মোচনে যিনি ছিলেন অগ্রণী, জারমান কমিউনিসট পারটির স্থপতিদের মধ্যে যিনি ছিলেন উজ্জল নক্ষত্রের মত সেই বিদুষী রোজা লুকসেমবুর্গ তো জানতেন ক্যাপিট্যালে মার্কসের বক্তব্য, প্রথম আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত। তিনি তো জানতেন উড়ো খবর মাত্রই তথ্য নয়। জারমানিতে মে-দিবস আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার কাজে রোজা লুকসেমবুর্গই ছিলেন অগ্রণী। সুতরাং মার্কস-এনগেলস বিরোধী, প্রথম আন্তর্জাতিক বিরোধী হিসাবেও তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় এবং তার অতি বড় সমালোচকরাও কেউ-ই এমন কথা উচ্চারণ করেননি। তবে রোজা কেন অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবিতে ধর্মঘটকে পাদটীকার সম্মান দিলেন?

এবার অন্য দিক থেকে প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যাক। ৮ ঘণ্টার লড়াই হচ্ছে মে-দিবসের উদ্ভবের মূল দাবি। এই দাবি নিয়ে অসট্রেলিয়ার ধর্মঘট ছিল বিচ্ছিন্ন। মনে রাখা দরকার ১৮৫৬ সালে অসট্রেলিয়ার জনসংখ্যা সাড়ে এগারো লক্ষেরও কম, আর আয়তন বিরাট। অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর। এক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সূত্র অনুসারে শ্রমশক্তির স্বল্পতাই অসট্রেলিয়ার


মে দিবসের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক অ্যালেকজেনদার ট্রাকটেনবার্গ

শ্রমিকদের জয়ী করেছিল। আর তাই এই জয়ে অন্য দেশের পুঁজিপতিরা তেমন শঙ্কিত হননি।

অসট্রেলিয়ার শ্রমিকরা কি আমেরিকার শ্রমিকদের মতো কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, ১৮৮৬ সালে বালটিমোরেতে সমবেত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কি জানতেন ৮ ঘণ্টার লড়াই-এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের কথা? এর জবাব পাই কুগেলম্যানকে লেখা মার্কসের একটি চিঠি থেকে: 'একই সময়ে বালটিমোরেতে হয়ে গেল আমেরিকান শ্রমিকদের কংগ্রেস। এই কংগ্রেস আমাকে আনন্দ দিয়েছে।—বিশেষ করে উল্লেখ করবার মত ব্যাপার হচ্ছে জেনিভার জন্য আমি যে দাবিপত্র লিখেছিলাম তার প্রায় সবটাই এখানে উত্থাপিত হয়েছে শ্রমিকদের সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই'। অর্থাৎ শ্রমিকদের সহজাত একটা প্রবৃত্তি থাকে, যা তাকে পথ দেখায়, প্রাথমিক ভাবে ঠিক করে দেয় কি করতে হবে। অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের এই সহজাত প্রবৃত্তির অভাব ঘটবার মত ভৌগোলিক-রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক - সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক কোন কারণ ঘটেছিল তা ভাবা অমূলক।

কিন্তু অসট্রেলিয়ার শ্রমিকদের ১৮৫৬ সালের ২১ এপ্রিলের ধর্মঘটকে যদি রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতো সে দেশের মালিকরা---তবে কি হতো? এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশেই আওয়াজ উঠতো প্রতিবাদের। কারণ সময়টা এমন—যখন দিকে দিকে ১৮৪৮-এর ব্যর্থ বিপ্লবগুলির প্রতিক্রিয়ায় সাময়িক পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে অপরিসীম শোষণের অধিকারকে চ্যালেনজ জানাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। যে-কারণে ৪ মে ১৮৮৬-র হিংস্র আক্রমণের ফলে 'লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে', সে-রকম কোনো ঘটনাই বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ অসট্রেলিয়ায় ঘটেনি।

স্পাইস, পারসনস, এনজেল, ফিশার-এর নাম আজ পৃথিবীর সবাই জানেন। ৮ ঘণ্টার লড়াইয়ের সঙ্গে তাদের নাম চিরকাল মানুষ স্মরণ করবে। কিন্তু সুদূর ও বিচ্ছিন্ন অসট্রেলিয়ার নাম না জানা হাজার হাজার বীর শ্রমিকদের কথা আমরা কেউ-ই জানতে পারলাম না।

এ বছরে আন্তর্জাতিক মে-দিবসের ৯০ বছর পূর্ণ হবে। মে-দিবসের শতবর্ষ পূর্ণ হবে, আর দশ বছর বাদে। এর মধ্যে কি ইতিহাসের পাতায় যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে না—১৮৫৬ সালের ২১ এপ্রিল? ★

রামবাবু যাদবের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী ?

জীবনময় দত্ত

রামবাবু যাদবের মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু? ওর বৃদ্ধ পিতার অশ্রু আজ শুকিয়ে গিয়েছে, চোখে শুধু জ্বলছে এই প্রশ্নটা। বড় ভাই পুণোশ্বর প্রসাদ যাদবের চোখেও এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা। কাঁদছে শুধু রামবাবুর যুবতী স্ত্রী, দুই ছেলে আর ছোট্ট মেয়েটি।

বিহারের এক অখ্যাত গ্রামের সাধারণ মানুষ রামবাবু যাদব। পাটনা থেকে ফুলওয়ারী শরীফের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। ফুলওয়ারী শরীফ থানার আওতায় ছোট্ট গ্রাম ধামাইল। সেই গ্রামের বাসিন্দা যাদবরা। ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনীর ভরা সংসার। রামবাবু অসুস্থ। বহুদিনের পেট ব্যথা কিছুতেই কমছে না তার। গ্রামের ডাক্তার দেখে যায়। ওষুধ খায়। ভরসা পায়—ও কিছু না। কিন্তু ভরসায় কাজ হয় না। ব্যথা কখনো কমে, কখনো বাড়ে। শেষ পর্যন্ত ফুলওয়ারী শরীফে ডাক্তার দেখান হলো। চললো ওষুধ। ফল একই। শেষে ব্যথা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে রামবাবু। গ্রামে শলা-পরামর্শ হলো অনেক। ঠিক হল পাটনার এক বিখ্যাত সারজনকে দেখান হবে। সেটা ১৯৭৭ সাল। নভেম্বরের শেষ। সারজন তখন সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। খুব নামডাক। প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমজমাট। বাড়িতেই অপারেশান থিয়েটার। প্রচুর রোগী। দূর-দূরান্ত থেকে আসে রোগীরা।

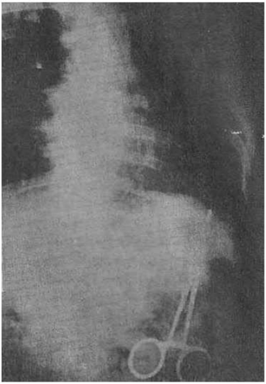


অক্সিজেনের সাহায্যে বাঁচার লড়াই-এ রামবাবু।

রামবাবুকে নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা করলেন সেই সারজন। তার মত, সম্পূর্ণ সারাতে হলে অপারেশান করতে হবে। রামবাবুরা তাতেই রাজি। অপারেশান হয়ে গেল। খরচ লাগল মাত্র এগারোশো টাকা। লাগুক টাকা। মানুষ বাঁচলে আরও অনেক টাকা হবে। সারজন ঘোষণা করলেন—অপারেশান সাকসেসফুল।

বাড়ি যাবার পরও রামবাবু মাঝে মধ্যেই পুরোনো অভিযোগটা আবার তুলত—ব্যথা হচ্ছে। আবার সারজনের কাছে ছুটে গেল বড় ভাই পুণোশ্বর। কিছু ট্যাবলেট ইত্যাদি দিলেন তিনি। সাময়িকভাবে কমলেও, কিছুদিন পর থেকেই ব্যথা ফের বাড়তে থাকে। তাছাড়া একটা বিশ্রী রকমের অস্বস্তি পেটের মধ্যে অনবরত পাক খেতে থাকে রামবাবুর। বারবার সারজন সাহেবের কাছে গিয়েও বিশেষ কোন ফল হল না। ১৯৭৮, '৭৯ দুটো বছর এভাবেই কাটল। এ বছর হোলির দিন, মারচ মাসের ১ তারিখ সারা বিহার রঙীলা হোলির উৎসবকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা। যাদব পরিবারে তার চিহ্ন মাত্র নেই। রামবাবুর সে সময় ব্যথা চরমে উঠল। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সারজন সাহেব এবার রক্ত, পায়খানা ও প্রস্রাব পরীক্ষা করালেন। কিছুই পাওয়া গেল না। কিছু ট্যাবলেট দিলেন নতুন করে। কোন লাভ হলো না। শেষে নিরুপায় হয়ে, অন্য এক নামকরা সারজনকে দেখানো হলো। তিনি পরামর্শ দিলেন এক্স-রে করাতে। এক্স-রে নেয়া হলো রামবাবুর পেটের। তখনই বিস্ফোরণ ঘটল। এক্স-রে প্লেটের বুকে ফুটে উঠল একটি 'আরটারি ফরসেপ'। সেই ১৯৭৭-এর অপারেশানের ফল। হৈ হৈ পড়ে গেল সারা পাটনায়। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল খবর। রামবাবুকে ভর্তি করা হলো পাটনা মেডিকেল কলেজের 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে'। রামবাবু হয়ে উঠল ভি আই পি। রোজই দলে দলে মানুষ রামবাবুকে দেখতে আসতে লাগল। কর্তৃপক্ষ হিমসিম খেয়ে গেলেন ওই জনতাকে আটকাতে। চলল যমে মানুষে টানাটানি। হতভাগ্য রামবাবুর দেহের সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা তখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল ৪ মারচ থেকে। শরীরে ক্ষীণ শক্তিও নেই যার ফলে নতুন করে অপারেশান করা যেতে পারে। দীর্ঘ ১১ দিন রামবাবুর জ্ঞান পুরোপুরি ছিল না। ১৫ মারচ ১৯৮০ সূর্য ওঠার সময় হঠাৎই জ্ঞান ফিরে এল। তারপরই সব শেষ।

রামবাবুর দেহে আগুন দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্ত্রী ও বাবার কান্নায় সমস্ত পরিবেশ বিষণ্ণ হয়ে



রামবাবুর পেটের এক্স রে প্লেটে আরটারি ফরসেপ

উঠেছিল। সব পুড়ে গেলো চিতার আগুনে। পোড়েনি শুধু একটা জিনিস। চিতাভস্মের মধ্যে চকচক করছিলো সেটা। শোকে মুহ্যমান রামবাবুর বৃদ্ধ পিতা সেই ছাইয়ের গাদা থেকে সেই ছ' ইনচি লম্বা অভিশপ্ত ফরসেপটি খুঁজে নিয়ে রাখলেন।

ক্ষুব্ধ পাটনাবাসীরা রামবাবুর মৃত্যুর তদন্ত দাবি করলেন। সংবাদপত্রে বিস্তর লেখালেখি হল। সরকার থেকে নীরবতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। রাজধানী দিল্লির লোকসভায় প্রশ্ন উঠল—কেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে না সমস্ত ঘটনার? যে চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের শিকার হলো রামবাবুর মতো একটি যুবক তা যেন ভবিষ্যতে অন্য কারও জীবনে না ঘটে সে ব্যবস্থা কেন করা হবে না? দিল্লির তরফ থেকে আজও কোন আশ্বাস মেলেনি।

পাটনায় এখনও পর্যন্ত এই সারজনের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা শোনা যায়নি। উলটে উঁচু মহলের কিছু লোক ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। রামবাবুর বাবা সুখদেব যাদবের কাছে সেই সারজনের সমস্ত প্রেসক্রিপশান, এক্স-রে প্লেট, ফরসেপ ইত্যাদি রয়েছে। নানা অছিলায় সারজনের প্রতিনিধি আসছে সেগুলো হস্তগত করার জন্যে। রামবাবুর বাবা, দাদা, প্রতিবেশীরা শক্ত হাতে সব আঁকড়ে ধরে আছেন। শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ওরা জানেন, যা কিছুই হোক সারজনের—রামবাবু আর কোনদিন ফিরবে না। তবু আর কাউকে যেন রামবাবুর মতো অকালে এভাবে চলে যেতে না হয় ওরা সেটাই চান। ★

আলোকচিত্র : কৃষ্ণমোহন শর্মা

মেষ : শরীর চলনসই। আর্থিক বিষয়ে নতুন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে প্রত্যাশিত ফললাভে বাধা। সামান্য আয়বৃদ্ধি। মেয়েদের কর্মস্থলে অন্য কারও অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে মানসিক অশান্তি। পারিবারিক ক্ষেত্রে কারও ওপর অবিশ্বাস কোন সমস্যাকে জটিয়ে রাখবে। স্ত্রীর পক্ষে ভাল সময়। কর্মপ্রার্থীদের অপ্রত্যাশিত কোন যোগাযোগ ঘটতে পারে। সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নি ব্যাপারে সাবধান। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আর্থিক ক্ষতি।

বৃষ : মাঝে মধ্যে শরীর উৎপাত করবে। আর্থিক ব্যাপারে ক্রমশ উন্নতি হলেও সামান্য ঋণযোগ। কর্মক্ষেত্রে কোন কাজে সাফল্যের মুখে বাধা। বকেয়া অর্থ আকস্মিক পাওয়া যেতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে পুরনো প্রচেষ্টায় সাফল্য। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সংযম ও ধৈর্যের প্রয়োজন। জমিজমা সম্পত্তি ক্রয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হবে। বন্ধুদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। ব্যবসায়ীদের নতুন কোন যোগাযোগ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বজন বিরোধ।

মিথুন : ছোট্ট অসুস্থতাও বেশ ভোগাতে পারে। আর্থিক ব্যাপার তেমন আশাপ্রদ নয়। সঞ্চয়ে টান পড়বার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে পুরনো সমস্যা মিটলেও প্রত্যাশিত ফললাভে বাধা। বিনা প্রচেষ্টায় আয়বৃদ্ধি। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন কারও সংগে উৎসাহিত করবে। পারিবারিক কোন বিষয়ে অহেতুক দুর্বলতা ক্ষতি করতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহ বিষয়ে কোন যোগাযোগ ভেঙে যাবার আশংকা। ভৃত্যদের দ্বারা অশান্তি। ব্যবসায়ীদের পুরনো সমস্যা নতুন করে দেখা দেবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অশান্তি।

কর্কট : স্বাস্থ্য ভাল চলবে, পূর্বের কোন রোগের সম্পূর্ণ নিরাময়। আর্থিক ব্যাপার পূর্বাপেক্ষা ভাল চললেও নানা-ভাবে ব্যয়বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনা উত্তেজিত করতে পারে। উল্লেখযোগ্য আয়বৃদ্ধি দুরাশা। মেয়েদের কর্মস্থলে অহেতুক মানসিক দুর্বলতা ক্ষতি করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কারও অযাচিত সাহায্য ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। ভাই-বোনদের সংগে সম্পর্কের অবনতি। নিজের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস ক্ষতি করতে পারে। ব্যবসায়ীদের আপাতত মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অশান্তি।

এই পক্ষ

[মে ১ থেকে ১৫]

সিংহ : মাঝে মধ্যে শরীর নিয়ে উদ্বেগ চলবে। আর্থিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগাযোগ এলেও তা ফলপ্রসূ হতে দেরি হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে পুরনো প্রচেষ্টার সাফল্য। আয়বৃদ্ধিতে বিশেষ মেহনত প্রয়োজন হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজের মতে অটল থাকলে ক্ষতি হবার আশংকা। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বন্ধু/আত্মীয়স্বজনের সংগে আলোচনা না করাই ভাল। স্ত্রীর আঘাত লাগতে পারে। ব্যবসায়ীদের মানসিক অশান্তি চলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার বাক সংযম প্রয়োজন।

কন্যা : শরীর আগের চেয়ে ভাল চলবে। সামান্য আঘাত লাগার সম্ভাবনা। আর্থিক ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত কারও সংগে যোগাযোগ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা চললেও সংযম ও ধৈর্যের প্রয়োজন। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজে সাফল্য। সহজ আয়বৃদ্ধি। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন ঘটনা উত্তেজিত করতে পারে। কোন বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তা। অবিবাহিতদের বিবাহ বিষয়ে কোন যোগাযোগ ভেঙে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নি ক্ষতিকারক হবার আশংকা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ঋণ।

তুলা : আকস্মিক অসুস্থতা বেশ বিব্রত করতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে প্রত্যাশিত ফললাভে বাধা। কর্মস্থলে নতুন কারও সংগে সম্পর্ক সুদূরপ্রসারী হবে। মেয়েদের পক্ষে কর্মক্ষেত্রে শুভ সময়। আয়বৃদ্ধি ব্যাপারে ঝামেলা। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে মানসিক উত্তেজনা। ভাই-বোনদের নিয়ে নতুন কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রেম প্রণয় ব্যাপারে সংঘাত। ব্যবসায়ীদের পুরনো প্রচেষ্টায় সাফল্য। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার নতুন কর্ম বিষয়ে যোগাযোগ।

বৃশ্চিক : নাক বা দাঁতের কোন রোগ মারাত্মক হতে পারে। আর্থিক ব্যাপার আশাপ্রদ। কর্মস্থলে পুরনো সমস্যার সাময়িক অবসান। মেয়েদের কর্মস্থলে মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ আসবে। আয়বৃদ্ধিতে জটিলতা। পারিবারিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে মতবিরোধ। অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সংযম ও ধৈর্যের প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। জমি-জমা ক্রয় ব্যাপারে আকস্মিক ঝকমারি। কর্ম-প্রার্থীদের কর্মপ্রাপ্তি বিষয়ে বিলম্ব। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ভ্রমণ বিষয়ে যোগাযোগ।

ধনু : মোটামুটি চলবে শরীর। আর্থিক ব্যাপারে নতুন অসুবিধে দেখা দিতে পারে : আকস্মিক ঋণে বিব্রত হবার আশংকা। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ও সংযম একান্ত প্রয়োজন। আয়বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। পারিবারিক ব্যাপারে সন্তানদের সংগে মনান্তর। কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিলে বড় কোন বিপদ দেখা দিতে পারে। বিবাহের যোগাযোগে সিদ্ধান্ত নিতে বাধা। দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য। ব্যবসায়ীদের সময় অশুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা।

মকর : সামান্য অসুস্থতা মারাত্মক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের মুখে বাধা। একক প্রচেষ্টায় আয়বৃদ্ধিতে অসাফল্য। পারিবারিক ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত কারও সংগে যোগাযোগে লাভ। আইন সংক্রান্ত কোন বিষয় জটিল আকার নিতে পারে। সন্তানদের কাজেকর্মে উন্নতির যোগ। মেয়েদের কোন বিশেষ আশা ফলবতী হতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে সাফল্য।

কুম্ভ : শরীর চলনসই। আর্থিক ব্যাপারে নতুন কোন যোগাযোগ। কর্মস্থলে সব দিকে বাধা, সর্ববিষয়ে অসাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন সমস্যায় বিব্রত হতে হবে। আয়বৃদ্ধির সুযোগ নষ্ট হবার প্রবল আশংকা। পারিবারিক কোন সমস্যা সমাধানে দূরে যেতে হতে পারে। বন্ধুদের সংগে আচরণে ধৈর্য ও সংযম প্রয়োজন। মেয়েদের বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানির আশংকা। কোন অস্ত্রোপচারও হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ সতর্কতা দরকার। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অশান্তি।

মীন : ছোটখাট অসুস্থতাই বেশি বিব্রত করবে। আর্থিক ব্যাপার আশাপ্রদ নয়। ব্যয়ের চাপ পক্ষ জুড়েই চলবে। কর্ম-স্থলে পুরনো কোন বিষয়ে অশান্তি। মেয়েদের কর্মস্থলে সময় সাফল্যের প্রতিকূল। আয়বৃদ্ধির যোগ নেই। পারিবারিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা। কোন প্রিয়জনের সংগে মনান্তর। স্ত্রীর কোন পুরনো রোগ বাড়তে পারে। কর্ম-প্রার্থীদের নতুন কোন যোগাযোগ ফলপ্রসূ না হবার আশংকা। চলা ফেরায় সাবধান ; পায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার গঠনমূলক কাজে সাফল্য।

শ্রীভট্ট

বিশ্ব-বিচিত্রা

অবদমিত ইচ্ছায়

বিশ্ব জয় করতে চেয়েছিলেন নেপোলিয়ান। জয়ের এই অদম্য স্পৃহা এসেছিলো যৌনতার কারণে। নেপোলিয়ান ছিলেন যৌন রোগী। নারীসঙ্গ তিনি কামনা করতেন, কিন্তু যে কোনো সঙ্গিনীর সামনে হয়ে পড়তেন যৌনদুর্বল। ফলে তার এই অবদমিত কামনার প্রকাশ ঘটতো রাজ্য জয়ে, অপর দেশকে নিজের অধীন রাখায়।

—ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস রবিনসন, রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিন জার্নালে এক প্রবন্ধ লিখে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

পাথুরে কাগজ

গলিত ব্যাসাল্ট পাথর থেকে সুতোর স্তর জমিয়ে কাগজ তৈরি হচ্ছে। বাদামী রঙের এই সুতো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হয়ে উঠছে ধবধবে সাদা। পাথুরে কাগজ এই কাগজের থেকে ৫ গুণ পাতলা, কিন্তু বেশি মজবুত। স্বচ্ছ থাকছে অথচ কালিও ঠিকমত ধরছে। এজন্যে তাই এই কাগজ পলিগ্রাফিক শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবিষ্কার করেছেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা।

টাক-টোটকা

চীনের পিয়াংসু প্রাগ্য হাসপাতালের ডাক্তার শ্রী ফেং চুনলির টাকে 'এখন সোনালী চুলের বন্যা। তাবৎ পুঁথিপত্র ঘেঁটে চুল গজাবার এই বিশল্যকরণী তার নিজেরই আবিষ্কার। উপকরণ মাত্র ৮টি ভেষজ দ্রব্য। ৮০টা বটিকা সেবনে মাথায় এই চুল। চুল ডাক্তারবাবুর মাথায়। চুল তারপর আরও ৭৭ জনেরও মাথায় অভাবনীয় ভাবে ফলেছে।

পক্ষে-বিপক্ষে

গর্ভপাত আইনকে বলবৎ রাখতে প্যারিসের প্রায় ৩০,০০০ লোক মিছিল করেছে। উদ্যোক্তা ২২টা ট্রেড ইউনিয়ন, বামপন্থীদলগুলো এবং মহিলা সমিতিরা। পরে আবার প্রায় সমান সংখ্যক লোকও পথে নেমেছে এর বিরোধিতায়। গর্ভাধানের ১০ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত ঘটানো এ আইনে বৈধ।

কাল্লোমানিক

আমেরিকার সংযুক্ত খনি-শ্রমিক সংস্থার কাছে ৬৫ জন মহিলা খনি-শ্রমিকের অভিযোগ ঃ ওদের স্নান-ঘরে উঁকি দিচ্ছে পুরুষ শ্রমিকরা। দেয়ালে



নগ্ন মহিলার ছবিও আঁকছে। ওদের নামে আজে-বাজে নোংরা ছড়াও কাটছে। নাম গোপন করতে চান, এমন একজন মহিলা চারলটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিনব্যাপী একটি সম্মেলনে ঘটনাটি ফাঁস করে দিয়েছেন।

একজোড়া

একটি যুগোস্লাভ প্রসূতি ২০ দিনের আড়াআড়িতে ২টি পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন। মহিলাটির নাম শ্রীমতী মিলজেজোব্কা টোসিক (২৫)। অকুস্থল বেলগ্রেডের প্রকুপলজি হাসপাতাল। খবরটি বেলগ্রেডের 'ভেসারনজি নোভোসটি' পত্রিকার।

খোদার ওপর খোদকারি

অস্ত্রোপচার। আর কিছু ওষুধপত্র। ব্যাস, পুরুষ থেকে নারী কিংবা নারী থেকে পুরুষ। ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য-মন্ত্রক তাদের দেশের ছটি হাসপাতালে সহজেই 'যৌন-পরিবর্তন' করা যায় বলে জানিয়েছেন। হাসপাতালগুলিতে রয়েছেন অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসক, মনোবিদ আর সমাজকল্যাণকর্মীরা। খরচও পড়ে খুব কম।

রাজ্যে রাজ্যে

স্লুইস গেট নামে, সরকারি যন্ত্র

পেরিয়ার নদীর ওপর মুল্লা পেরিয়ার বাঁধ তৈরি হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। এই বাঁধ তৈরির ৯৯ বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন মাদ্রাজ সরকার এবং ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা।

সাধারণত নদী শাসন করার জন্যেই বাঁধ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পেরিয়ার নদীর ওপর এই বাঁধ এখন সাধারণ মানুষ ও সরকারের পক্ষে এক দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমনিতে পেরিয়ার অভয়ারণ্য সারা ভারতেরই একটা মনোরম বেড়াবার জায়গা। এই নদীর দু'পাশে অরণ্য ছাড়াও বাগিচার কাজ হয় খুব ব্যাপক ভাবে। এই কাজে রয়েছেন চল্লিশ হাজার মানুষ। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার আশি লোক পেরিয়ার নদী আর মুল্লা পেরিয়ার বাঁধ নিয়ে রীতিমত চিন্তা করছে এই কারণে যে বাঁধে দেখা দিয়েছে মস্ত এক ফাটল। সাধারণ মানুষ অনেকবার বলে বলেও কোন ফল হয়নি। ফলে গত নভেম্বর মাসে পীরমেড় তালুকে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘট এমন সার্থক হয়েছিল যে, বলা চলতে পারে একটা কাকচিলও ওড়েনি। তার মানে এখানকার লোকেদের সত্যিকারের ভীতিটা কত আন্তরিক তা বোঝা যায়।

মুল্লা পেরিয়ার বাঁধে ফাটল আজ নতুন দেখা দিচ্ছে না। প্রথম এই ফাটল চোখে পড়ে ১৯৩২ সালে। বৃটিশ ইনজিনিয়াররা যখন এই বাঁধ তৈরি করেন তখন উদ্দেশ্য ছিল, এখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তামিলনাড়ুর মাদুরাই ও রামনাথপুরম জেলা দুটির জন্যে। তখনই কথা হয়েছিল, বাঁধের অবস্থার দিকে সব সময়েই নজর রাখতে হবে। ১৯৬১ এবং '৬২ সালেও দুবার ফাটলের কথা বলা হয়। তখন কিছু পলেস্তরা মেরে নমো নমো করে কাজ সারা হয়।

এই বাঁধে সর্বোচ্চ ১৫২ ফুট জল সংগ্রহ রাখার কথা। তার বেশি হয়ে গেলে বিদ্যুৎচালিত স্লুইস গেট দিয়ে বের করে দিতে হবে।

কেরল সরকার ব্যাপারটা নিয়ে তড়িঘড়ি তামিলনাড়ু সরকার এবং সেনট্রাল ওয়াটার কমিশনের কাছে ছুটে গেলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল যদিও এখানে ১৫২ ফুট সর্বোচ্চ জল-সীমার কথা বলা হয়েছে, আসলে এই নড়বড়ে অবস্থায় ১৩৬ ফুট পর্যন্ত জল রাখা উচিত। কিন্তু সেনট্রাল ওয়াটার কমিশন নির্বিকারভাবে বলে দিলেন ভয়ের কোন কারণই নেই।

বাগিচা শ্রমিকদের ঐ নভেম্বর-ধর্মঘটের পর ওয়াটার কমিশনের টনক নড়ে। ফাটলের ব্যবস্থা করতে এসে তারা বলে, অতিরিক্ত জল ছেড়ে দেবার জন্যে যে বৈদ্যুতিক স্লুইস গেট ছিল তা খারাপ হয়ে গেছে। তামিলনাড়ু সরকার তখন কেরল সরকারকে দোষারোপ করতে শুরু করে, তারা নাকি উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বৈদ্যুতিক স্লুইস গেটটি চালু রাখেনি।

সামান্য একটা স্লুইস গেটের জন্যে দক্ষিণ ভারতে মারভির মতো যে কোন মুহূর্তে আর একটি ভয়াবহ বন্যা ঘটে যেতে পারে। আর সে বন্যা যদি হয় তবে নির্মীয়মাণ বিশালাকৃতির ইদ্দুকি নদী-শাসক প্রকল্পও বানচাল হয়ে পারে।

জেলায় জেলায়

নয়াগ্রামের খড়িকা মোড়ের একটি মেলায় সুধীর মাহাতো নামে জনৈক প্রাথমিক শিক্ষক স্রেফ লাঠির আঘাতে মারা যান। সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি সুধীরের চাকুরীর জন্য তদ্বির তদারক করে। সর্ত থাকে তার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু চাকরী পাওয়ার পর সুধীর বেঁকে বসে। মেয়ের বাপ কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সাহায্যে মারধোরের ষড়যন্ত্র করে।



দুষ্কৃতকারীরা চড়াও হয়ে লাঠি পিটিয়ে তাকে হত্যা করে।

(অঙ্কুশ/মেদিনীপুর)

করুমগ্রাম হাসপাতালে ১৮টি গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেন। অথচ গত এক বছর যাবৎ এখানে কোন ডাক্তার নেই।

নিকটবর্তী হাসপাতাল রামপুরহাট দশমাইল দূরে। মুমূর্ষুর প্রাণ বিনা-চিকিৎসায় যাত্রাপথেই বিনষ্ট হয়।

(দিদিভাই/বীরভূম)

বহরমপুর কোর্ট রোড স্টেশন প্ল্যাটফরমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল যাবৎ ট্রেনে কাটা লাশগুলি বীভৎসভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দুর্গন্ধময় বহু লাশের জন্য যাত্রী সাধারণ উক্ত প্ল্যাটফরম এলাকায় অপেক্ষা করতে পারেন না। ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান অসুস্থ দুর্বল যাত্রীরা বিশেষ করে শিশুরা বিকৃত লাশ দেখে প্রচণ্ডভাবে ভয় পায়। এ ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষ ও রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

(মিঠৈকড়া/লালগোলা)

ছবি এঁকেছেন ঃ ঋজু সাহা

ওপার বাংলা



শেখ নজরুল পরিচালিত 'এতিম' ছবিতে মাঃ শাফিক মঞ্জুর হোসেন ও ববিতা

কালো বই

ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের অভিভাবক-দের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। ঢাকা, খুলনা, নোয়াখালী, ময়মনসিং—সর্বত্রই। এ দোকান সে দোকান ঘুরেও পাঠ্যপুস্তক মিলছে না কোথাও। স্কুল টেকসট বুক বোর্ডের ডিলারদের কাছে বই নেই। বই কিন্তু বিক্রি হচ্ছে কালোবাজারে। সেখানে ক্লাস সিকসের এক সেট বই যার সরকারি দাম ১৬ টাকা, বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। আবার এর সঙ্গে আরেক সমস্যাও আছে—যার দরকার শুধু পাটিগণিত বইটি, সে বই পাবে না। কিনতে হবে পুরো সেট—বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান—সব বই।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

অভিনব প্রদর্শনী

ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে লোকারণ্য। না, খেলাধুলোর ভিড় নয়, স্টেডিয়ামে চলছে এক অভিনব প্রদর্শনী। আয়োজন করেছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা। সার দিয়ে তারা সাজিয়ে রেখেছেন ৬৪টি বাস, থুড়ি, বাসের কংকাল। পোড়া, দোমড়ানো, কাচভাঙা সরকারি বাস।

সবগুলিই হরতালের বলি বাকশাল পার্টির ডাকে ৯ ফেব্রুয়ারি যে ধর্মঘট হয় তাতেই এই দশা হয়েছে বাসগুলির। ঐ দিন মোট ৭১টি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্পত্তি বিনষ্ট হয় ১৭ লক্ষ টাকার।

আর প্রাণ? হাঁ। তাও ঝরেছে দু-দুটি। রাজনৈতিক কর্মী নুরুল আলম আর নাম-না-জানা এক কিশোর।

(দৈনিক বাংলা)

নিষিদ্ধ ফল

না, এ ছবি দেখানো চলবে না।—বাংলাদেশ সরকার 'সাম গারলস ডু' নামের একটি ইংরেজি চলচ্চিত্রের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছেন। সরকারি রায়ে নিষিদ্ধ হয়েছে একটি বাংলা চলচ্চিত্রও। ছবির নাম : বাঁশের ঘর। প্রযোজক : বেগম নীলা হাবিব।

(বাংলাদেশ অবজারভার)

শ্লোগান বনাম প্রতিশ্রুতি

দল বেদলের সস্তা শ্লোগানে ভুল করবেন না। আমরা আছি, আপনাদের সব রকমের সমস্যা সরকার দূর করবে। শিগগিরই বাস্তবানুগ শ্রমনীতি আমরা চালু করবো।—চট্টগ্রামে শ্রমিক সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাংলাদেশের জাহাজমন্ত্রী জনাব নুরুল হক।

(বাংলাদেশ টাইমস)

চোর, চুরি, চানাচুর

কুমিল্লা থেকে বাস ছুটে চলেছে ঢাকার দিকে। মিসেস সাহিদা রহমান আসছিলেন ঐ বাসেই। দীর্ঘ পথ সহযাত্রিণীর সঙ্গে গল্পে গল্পে দিব্যি সময় কাটছিলো।

চানাচুর খাবেন?—সহযাত্রিণীর প্রশ্নে সাহিদা ভাবলেন মন্দ কি! দুই 'বান্ধবী' চানাচুর খেলেন—তারপর আর কিছু মনে নেই সাহিদার। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ঢাকায় এসে ঘুম ভাঙলো: ভ্যানিটি ব্যাগ খুলেই দেখলেন ব্যাগে তার গহনা, ঘড়ি, টাকা কিচ্ছু নেই। উধাও সহযাত্রিণী বান্ধবীও।

রমনা থানার ফরিদউদ্দিন কনস-টেবল কিন্তু ওস্তাদ লোক। ঐ বাসের আবুল হাশান নামে এক যাত্রীর সাহায্যে ফরিদউদ্দিন ঠিক পাকড়াও করলো বিলকিস নুর নাম্নী এক তরুণীকে। তার কাছেই পাওয়া গেলো সাহিদা বিবির অলংকার, ঘড়ি, টাকা।

(দৈনিক বাংলা)

হালের গরুর অভাবে

গরীব চাষীদের মাথায় হাত। গরু নেই চাষ করবেন কি করে! যশোর জেলার সর্বত্র, ফরিদপুরের গোয়ালন্দ মহকুমা আর রংপুরের ফুলবাড়ি, লালমণির হাট প্রভৃতি অঞ্চলে অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। সবার গোয়াল শূন্য।

গরু না থাকার প্রথম কারণ: দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের তাড়নায় চাষীদের অনেকেই তাদের গরু বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ: ক্ষুধা। পেটের দায়ে অনেকেই জবাই করেছেন গো-সম্পদ। আর তৃতীয় কারণ: গো-মড়ক।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

একাদেমী পুরস্কার

১৯৭৯-এর বাংলা একাদেমী পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। এবার মোট সাতজন কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, অনুবাদক এ সম্মান পেয়েছেন।

কবিতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। ছোট গল্পে আবদুস শাকুর, অনুবাদে আবু শাহরিয়ার। প্রবন্ধ ও গবেষণায় ডঃ মজহারুল হক ও আহমদ রফিক। শিশু সাহিত্যে শামসুল হক।

(দৈনিক সংবাদ)

প্রদীপ নিজেই নেভালো নিজেকে

বাড়ির পিছনে আছে বাঁশঝাড়। রোজ রাত্রে কারা যেন ঐ বাঁশ কেটে নিয়ে যায়। শুকুর আলীর ছেলে প্রদীপ চোর ধরতে পাহারা দিচ্ছিলো বাঁশঝাড়। অন্ধকার রাত্রি। প্রদীপের কোমরে গোঁজা মস্ত চাকু। বাঁশঝাড়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পা পিছলে গেলো তার। আর তাতেই ছোরাটা গেঁথে গেলো তলপেটে।

সঙ্গে সঙ্গে সাতক্ষীরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। কিন্তু প্রদীপ জ্বললো না আর।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

বহুপুত্রক

ঝিনাইদহের চাষীর ছেলে রায়হান-উদ্দিন শুধু জমির ফসল উৎপাদনেই কৃতী তাই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও—৬৬ বছর বয়স্ক সরকারপুরের এই কৃষিবিদের মোট সন্তান সংখ্যা একশ' চার! অবশ্য মারা গেছে বাইশটি সন্তান।

এই গ্রামেরই আবদুল হোসেনের দুই বিবির সন্তান সংখ্যা একচল্লিশ আর নাতি-নাতনি? তাও শ' দু'ই ছুঁই—সাতানব্বই।

(বাংলাদেশ টাইমস)

আল্লার দোয়া?

যশোর-সাতক্ষীরা রোডের পাশেই মাইচম্পা দরগা হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার স্থান। দরগার পাশেই মুকুলিত আমগাছ।

ফালগুনের এক সকালে হঠাৎই একটা পাকা আম কুড়িয়ে পায় রানী—স্থানীয় ইউ পি সদস্যের মেয়ে। অসময়ের এই আমকে সবাই ভাবছেন আল্লার দোয়া। ভিড় বাড়ছে মাই-চম্পার দরগায়।

(দৈনিক বাংলা)

লং রুট

ঠাকুর গাঁ থেকে দেবিগঞ্জের দূরত্ব মাত্র ১৪ মাইল। কিন্তু ঠাকুর গাঁ পৌঁছাতে দেবিগঞ্জের মানুষকে পথ পেরোতে হয় ৯০ মাইল!

একই হাল পাটগ্রামের লোকেদেরও। জেলার সদর রংপুরে পৌঁছাতে ২২ মাইলের পথ ৭০ মাইল হয়ে যায়।

সংস্কারবিহীন রাস্তার জন্যেই দূরত্ব আর দুর্ভোগের বহর বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

সমাজের উঁচু মহলের লোকেরাই মাফিয়াদের নেতৃত্ব দেয়

যীশু চৌধুরী

জ্যাকুইস মেসরিন নামটা সকলের কাছেই ছিল পরিচিত। কিন্তু ঐ নামে সে কোনদিনই জনসমক্ষে হাজির হয়নি। ডাকাতি করতে যাবার সময় কখনও তার নাম হতো গ্যালিক জেসে জেমস, কখনও বা ক্লাইদ বরো কখনও বা আর কিছু। অবশ্য নিজের একটা প্রিয় নাম সে অনেক সময়ই ব্যবহার করত, তা রবিন হুড। লোকটা এক নম্বরের স্যাডিসট। শিকারকে পাকড়াও করে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পিটত।

'মিনিট' বলে একটি ফরাসি কাগজে তার সম্পর্কে সাংঘাতিক কড়া ভাষায় একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার সাংবাদিক জ্যাকুইস টিলিয়ারকে সে আমন্ত্রণ করল কথাবার্তা বলার জন্য। সেখান থেকে তাকে ইলোপ করে নিজের ডেরায় নিয়ে যায় এবং উলঙ্গ করে প্রচণ্ড মারধর করে। পরে গুলি করে টিলিয়ারকে। টিলিয়ার মড়ার মত ভান করে পড়ে থাকে। পরে সুযোগ বুঝে পালায়। অবশ্য জ্যাকুইস কয়েকটি খবরের কাগজে সেই অত্যাচারের ছবি পাঠিয়ে জবাবদিহি করে, ওকে তো মারতে চাইনি আমি—মারলে তো মরেই যেত।

মেসরিন নিজের প্রচার চাইত খুব। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সে প্যারির মফঃস্বল অঞ্চলে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াত বান্ধবীর হাত ধরে। হাতে ঝোলানো থাকত কালাশনিকোভ মেসিনগান। কখনও কখনও রাস্তার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালিয়ে যেত, ট্রাফিক পুলিশের নিষেধ অমান্য করেই।

১৯৭৮ মে মাসে ডাকাতি আর হেনস্তা করার অপরাধে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় কুড়ি বছরের। লা সাঁত-এর কারাগার ফ্রান্সের সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার। সেখান থেকে মেসরিন পালিয়ে যে বিচারক তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন সেই শারল পেটির বাড়ি গিয়ে উঠল। টিপটপ একজন পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশ; বুঝে ওঠার আগেই শারল পেটির প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

ফলে পুলিশের কাছে এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। যেমন করে হোক তাকে ধরতেই হবে। বিশেষ এই কাজের জন্যেই একজন পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হলো। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ একদিন খবর পেল মেসরিনকে দেখা গেছে বুলভার অরনানদোয়, বান্ধবী সিলভি জ্যাজোকুয়োর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের কর্তা, বাওডে সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে তার খোঁজ খবর লাগালেন। পোরডে দ্য ক্লিশগানকোরতের কাছে তার ফ্ল্যাটও পাওয়া গেল। ঘিরে ফেলল পুলিশ সেই ফ্ল্যাট। মেসরিন নিজের গাড়ি করে পালাতে গেল কিন্তু তার আগেই গুলি চালিয়ে পুলিশ তার দস্যু জীবনের নিকেশ করল।

পশ্চিমী উন্নত দেশগুলিতে দস্যুবৃত্তি ও গুণ্ডামির একটা সংঘবদ্ধ চেহারা সব সময়ই দেখা যায়। এই গুণ্ডাদের মাথা যারা, সব সময়ই সমাজের উঁচুতলার লোক। আন্তর্জাতিকভাবে এদের ডাকা হয় মাফিয়া বলে। এই মাফিয়ারা মূলত আমেরিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী। আড়কাঠির মাধ্যমে এরা উজ্জ্বল, সাহসী যুবকদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। কিংবা বলা চলতে পারে ঐ সব যুবার দল কোন না কোন ভাবে মাফিয়ার পাপচক্রে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়।

মেসরিন ছিল ফ্রান্সের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলে। তবু সে রেহাই পেল না। তার বাবা একজন নামকরা টেকসটাইল ডিজাইনার। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে মেসরিন ফ্রান্সের পক্ষে লড়েছিল। সেই লড়াই-এ সে বীরত্বের জন্য পদক পায়। যুদ্ধশেষে ফ্রান্সে ফিরে এসে কী এমন চক্রে পড়ল মেসরিন, যার জন্য তার উজ্জ্বল সামাজিক জীবনের অবসান ঘটল?

সে কথা কেউ জানে না; তবে অন্য দেশের মাফিয়াদের খোঁজখবর নিলে এই ফাঁদপাতার খবর কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে মাফিয়াদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল। কিন্তু তার আগে কয়েকটি ছোটখাট দেশের মাফিয়ার কীর্তিকলাপ বলে নেওয়া যাক। তাইওয়ানের পেইতু হচ্ছে পৃথিবীবিখ্যাত পতিতাপল্লী। মারকিন সেনাদের এখানে অবাধ যাতায়াত। জাপানীরা তাইওয়ান দখল করে রাখে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। সেই সময়ই পেইতুর আন্তর্জাতিক নাম ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চাশ বছরের দখলদারির সময় এই অঞ্চলের যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠে চা-খানা, মাসাজক্লিনিক, গরমজলে স্নানের জায়গা, অবাধ ঘুমোনোর জায়গা।

আধা গেইজা, আধা পতিতা মেয়েরা এইসব উঠতি ব্যবসার মালিক হয়ে বসে। মালিক মানে তারাই দোকানের কর্তা, তারাই কর্মচারী এবং তারাই খদ্দেরের মনোরঞ্জনে সদাপ্রস্তুত। ওপরে ওপরে ঐ সব মেয়েরা মালিক হলেও এর প্রকৃত মালিক কিন্তু মামা-সান গোষ্ঠি। মামা-সানদের দুটো বোরডিং হাউস আছে পেইতুতে। এই বোরডিং হাউসে যে সব মারকিন সেনা ও পর্যটক আসে তারা নারী সঙ্গ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব দোকানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফরমোজা সরকার এই বোরডিং হাউস এবং ছোট ছোট দোকান বন্ধ করে দিতে চাইলে ১৯৭৪ সালে মামা-সানরা হুমকি দেয়। ফলে এ অঞ্চলে পর্যটকের সংখ্যা ৮৫ শতাংশ থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। পেইতুর হোটেল অ্যাসোসিয়েশন তারপর মামা-সানদের কাছ থেকে লিখিত ভাবে ক্ষমা চেয়ে নেয়। মামা-সানরা তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় মাফিয়া গোষ্ঠী। সহজেই বুঝতে পারছেন তাইওয়ান সরকার কত অসহায় এদের কাছে। মামা-সান মাফিয়াদের বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করা সে সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভবই। সরকার অধঃপতিত মেয়েদের জন্য সেলাইকল চালানো লেখাপড়ার বা অন্যান্য হাতেকলমে কাজের ব্যবস্থা করেছিল পুনর্বাসনের নামে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার সেই পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য একটি মেয়েও হাজির হয়নি। অথচ লাইসেনসপ্রাপ্ত ৪৮৬ জন পতিতার সকলেই এই পুনর্বাসনে রাজি হয়েছিল।



বহুরূপী মেসরিন : তবু যেন চেনা মুখ

ইতালির মাফিয়াদের বলা হয় মাফিওসি। এরা অবশ্য অন্য উন্নত দেশের মত এখনও সামাজিক গৌরবের কাজে লিপ্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু চুপ করে তো বসে থাকা চলে না। ফলে ইতালির সরকার সম্প্রতি দক্ষিণ ইতালিকে শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এই শিল্প উৎপাদনে লেগে পড়তে পারলে শুধু যে কোটি কোটি বৈধ টাকা তাই-ই নয়, সেই সঙ্গে আসবে প্রভূত সম্মানও।

কালাব্রিয়াতে যখন বিশাল লৌহ ও ইসপাত কারখানা তৈরির কথা উঠল তখন স্থানীয় মাফিয়া-কর্তা পরিবহনের কনট্রাকট নেবার প্রস্তাব দিল। পরিকল্পনা কর্তারা তাদের এ প্রস্তাবে বিব্রত হয়ে পড়ল। হয় তাদের কনট্রাকট দিয়ে জনসমক্ষে কেলেঙ্কারি করতে হয়, না হয় মাফিওসিদের ব্ল্যাক লিসটে নিজেদের নাম তুলতে হয়। তখন তারা মাফিওসির কাছে প্রস্তাব দিল, কারখানার তিন শতাংশ তারা তৈরি করে দেবে কিন্তু পুরো প্রকল্পটি থেকে দূরে থাকবে। মাফিওসির কর্তা তাতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। ফলে এখন হয়তো কারখানা তৈরির পুরো পরিকল্পনাটাই বাতিল করতে হবে।

জাপানের মাফিয়ারা অবশ্য এত সস্তা কারবার করে না। এখানকার মাফিয়াদের বলা হয় ইয়াকুজা। ইয়াকুজাদের ইতিহাস খুব পুরনো। জাপানী ইদো সাম্রাজ্যের যুগেও এরা ছিল অন্যভাবে। সেটা ১৬০৯ সালের কথা। সাম্রাজ্যরক্ষার প্রকাশ্য কাজকর্ম করত সামুরাই বাহিনী আর গোপন তদারকি করত ইয়াকুজা।

আগের কালে ইয়াকুজারা কাজ করত একেবারে গোপনে। 'ইয়াকুজা শিমা' বলে একটা কথা চালু ছিল। এর মানে ইয়াকুজাদের নিজস্ব দ্বীপ। কোন একটা ইয়াকুজার দল আর এক দলের চৌহদ্দিতে নাক গলাত না। আপনা মহল্লায় আপনিই রাজা। কোন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা মেলামেশা করত না। অরডার পেলেই কম্ম ফতে করতে তারা সবসময় তৈরি থাকত। তবে আগের দিনে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল, বিনা কারণে ইয়াকুজারা কারোর গায়ে হাত দেবে না।

কিন্তু ইদো যুগের সঙ্গে এখনকার জাপানের আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখনকার ইয়াকুজারা সাধারণ মানুষের মধ্যেই মিশে থাকে। তারা এখন অনেক বেশি নিষ্ঠুর, যেন অমোঘ শক্তি নিয়ে হাজির হয়। মনে পড়ে সেই এনটার দ্য ড্রাগন ছবিটার কথা? তাদের হাত থেকে পালাবার যেন কোন রাস্তাই নেই। জাপানের যে কোন মেয়েপুরুষকে নিয়ে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

এখনকার জাপানে টি ভি খুললেই চোখে পড়বে পুলিশের গুণ্ডাধরার কাহিনী। অদ্ভুত



পেইন্ডুর পতিতালয়ে পুণ্যস্নান : পাত্তা সেই মাফিয়া

ব্যাপার, যে কোন মাফিয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে মামলায় ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু সেখানকার প্রচলিত আইন এমনই যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী আর ইয়াকুজার বিচার হয় একই ভাবে। ফলে এদের দাপট অনেকটা চাপা পড়ে যায়। খবরের কাগজও ইয়াকুজাদের সঙ্গে পুলিশের মারামারির বীভৎস সব খবর ছাপায়।

জাপানে ইয়াকুজাদের মধ্যে সবচেয়ে মস্তান লোকটি হল কাজুকো তাওকা। সে প্রখ্যাত অপরাধী পরিবার ইয়ামাগুচিগুমি পরিবারের কর্তা। তাওকা হচ্ছে শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে যমের মত। আইন কাইনের ধার ধারে না। তার দলবলের কাজই সেখানে আইন। অমন আইন সে রোজ দুবেলা তৈরি করতে পারে। এই সত্তর বছর বয়সেও সে আগের মতই ভয়াবহ। ছোট বেলায় কিছু বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে প্রকাশ্যে বদমাইশি করে বেড়াত। আর একটু বড় হলে একটা দলই তৈরি করে ফেলল। যখন কাউকে অপছন্দ হত দুটি আঙুল দিয়ে শিকারের চোখ দুটো সোজাসুজি উপড়ে নিত। দাগী বদমাশরা এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখে খুশি হয়েছিল।

অতি সম্প্রতি কাজুকো তাওকা একটা আত্মজীবনীও লিখেছে। বইটা প্রচুর বিক্রি হয়েছে। ১৯৭৩ সালে একটা ফিলম তৈরি হয় জাপানে যার নাম দ্য থারড জেনারেশন অব দ্য ইয়ামাগুচিগুমি গ্যাং। তাওকা ত্রিশ বছর ধরে যে সব বদমাইশি করেছে তার সবগুলিই এই ছবিতে দুটি অংশে দেখানো হয়েছে। এর প্রযোজক তোয়েয়ি ফিলম কোমপানি।

তোয়েয়ি ফিলম কোমপানিকে কে টাকা যোগায় তা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু সব ছবিই মারদাঙ্গার গল্প নিয়ে তোলা। জাপানে এ নিয়ে প্রচুর বাদ প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু টাকার জোরের কাছে সেখানে পারবে কে?

তাওকার দলের সরকারি নাম 'মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা পরিষদ'। পুলিশের হিসেবে এর সদস্যসংখ্যা দশ হাজার। কিন্তু তাওকার নিজের মতে এর সদস্য সংখ্যা আসলে ৩ লক্ষ।

ইয়াকুজাদের গ্যাং জাপানে আছে প্রায় আড়াই হাজার। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গ্যাংগুলোর সঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ জাপানির যোগাযোগ আছে। আর দেশের মোট জনসংখ্যা দশ কোটি। এই ইয়াকুজারা জাপানে ত্রিশ হাজার ব্যাংক, কলকারখানা এবং এজেনসির মালিক। এই সব বৈধ ব্যবসা থেকে তারা কত আয় করে তার ঠিক ঠিক হিসেব পুলিশ জানে না, সরকার তো নয়ই। তবে সাদা টাকায় নাকি তিরিশ শো কোটি ইয়েন (৯০ কোটি টাকা)। এরা সব আইনের বাইরে। জুয়ার আডডা থেকে পুলিশ হয়তো আড়াই শো লোককে হঠাৎ হানা দিয়ে সকালবেলা গ্রেপ্তার করল। বিকেলেই দেখা গেল তারা বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কে এসবের প্রতিবাদ করবে? জাপানের অন্যতম নামকরা কাগজ 'ইয়োমিউরি' একবার লিখল জাপানে যত অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূলে রয়েছে ইয়াকুজারা। পরদিনই সকালে একদল গুণ্ডা এসে কাগজের অফিসে চড়াও হল। ভেঙে তছনছ করে দিল সম্পাদকীয় দপ্তর। সব মিটে যাবার পর পুলিশ এসে এগারো জন গুরুতর আহত কর্মীকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

তবে ইয়াকুজাদের দিয়ে একটা সুবিধে হয় জাপানে। সেখানে রাস্তাঘাটে কোন চুরি ছিনতাই একবারেই হয়না। কারণ সেখানে কোন ছোটখাট মস্তান তৈরি হয় না। আলাদা ভাবে কোনরকম মস্তানি করতে এলেই ঝাড় খেতে হবে। আর ইয়াকুজারা কখনই পরিকল্পনা ছাড়া কোন মস্তানি করে না। কাগজের অফিসেও যে হামলা হয়েছিল সেটা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েই করা হয়েছিল। সেইজন্যে



লাস ভেগাসের জুয়াখানায় জুয়োর চাল দিয়েছেন মারিও পুজো : ভাগ্যফল মাফিয়া গ্যাংদের হাতে

সরকারও বিদেশী অতিথির অভ্যর্থনার সময় বা কোন জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে ইয়াকুজাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে যাতে কোন বেমক্কা ঝামেলা না হয়।

জাপানের পুলিশ-প্রধান ইমানুসা একবার বলেছিলেন, ইয়ামাগুচিগুমিদের সবাইকে এক-সঙ্গে জেলে না পুরলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করবে না যে পুলিশ সত্যিই কিছু করতে চায়। এটা পুলিশের একটা সদিচ্ছা মাত্র। কাজে কোনদিন লাগানো হবে না। কারণ ইমানুসা ওকথা বলার পর পাঁচবছর কেটে গেছে।

ইয়াকুজাদের সংগঠন খুব নিয়মনিগড়ে বাধা। প্রত্যেক ইয়াকুজা পরিবারের কর্তা হবে 'ওয়াবুন'। মানে বাবা। কেউ অপরাধ করলে ওয়াবুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বুক চিরে রক্ত দিতে হবে। ওয়াবুন-এর অধীনে থাকে সহকারীরা। তারাই গুণ্ডা বদমাস রিক্রুট করে, কাজের পরিকল্পনা নেয় ও সব শেষে ওয়াবুনকে জানিয়ে দেয়। ওয়াবুন সেই অনুযায়ী অ্যাকশন নেয়।

জাপানের এইসব মাফিয়ারাও বাচ্চা ছেলে বনে যাবে যদি তারা মারকিন মাফিয়াদের পাল্লায় পড়ে। আসল মাফিয়া বলতে এই মারকিন মাফিয়ারাই। সেখানকার মাফিয়াদের নিয়ে সম্প্রতি দুটি ছবিও হয়ে গেছে। 'গডফাদার' (১ ও ২) কলকাতার দর্শকরাও দেখেছেন। গডফাদার-এর লেখক মারিও পুজো এখন আমেরিকার বেসট সেলার লেখক। তার যে কোন বই এখন হট কেকের মতন বিক্রি হয়। আর বই-এর ব্যবসা সেখানে সোয়াবীন কিংবা শূকরের মাংসের মতই লোভনীয়। সে দেশের সরকার রপ্তানী নীতির ক্ষেত্রে ওগুলোকে একচোখেই দেখে।

মারিও পুজোর 'ফুলস ডাই' পেপারব্যাক এখন সকলের হাতে হাতে ঘুরছে। তবে যে কেউ তো আর যে কোন বই-এর প্রকাশক হতে পারেন না। লেখক নীলাম ডাকেন, নীলামে যে সবচেয়ে বেশি দাম দেবে সেই প্রকাশনার অনুমতি পাবে। মস্তানি আর ফেরেব্বাজি নিয়ে যত বই এখন মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে বেরোয় তত বই বোধহয় অন্য বিষয় নিয়ে বেরোয় না। এর কারণও একই। সামাজিক জীবন যে খাতে বয় সে জীবন নিয়ে তো লেখালিখি বেশি হবেই।

সাতান্ন বছর বয়স্ক মারিও পুজো নিজেই বলেছেন, 'আমার কাছে লেখালেখিটা ব্যবসা ছাড়া কিছুই নয়।' আর সত্যিই তাই। সেখানে একজন লেখকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ব্যবসার এজেনট, লইয়ার, ইনকাম ট্যাকস কনসালট্যানট সবই আছে।

কিন্তু এরকম তো অনেক লেখকেরই আছে। শ্রেষ্ঠ দশটি বেসট সেলারের মধ্যে প্রথম স্থানেই গডফাদারের। এটার পেপার ব্যাক ছাপানো হয়েছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ কপি। দ্বিতীয় বই দ্য একসোরসিসট কিন্তু ছাপানো হয়েছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ কপি। তফাৎ বেশি নেই, তাহলে গডফাদার সম্পর্কে এত বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি কেন?

অনেকে বলেন মারকিন অনেক নামকরা লোকের মতনই মারিও পুজো নিজে সমাজের অন্ধকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পুজো নিজে সেটা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার বন্ধুরাই বলেন, তিনি যখন সত্যিকারের সাহিত্য করতেন তখন খেতে পেতেন না এবং কোন প্রচারও তখন পাননি। ১৯৫৫ সালে 'দ ডারক এরেনা' বলে তার বই বেরিয়েছিল। তার বন্ধু উপন্যাসিক জরজ ম্যানডেল বলছেন, পুজো তখন ট্যাকসি নিয়ে ভাই-এর বাড়ি যেত নিজের ছেলের জুতো কিনবে বলে টাকা ধার করতে। তারপরই গল ব্লাডারের ফলে হাসপাতালে ভর্তি হলেন পুজো। ২৩নং রাস্তার ভেটেরানস অ্যাডমিনিসট্রেশন হাসপাতালে থাকার সময়ই পুজোর ভোল পালটে গেল।

পুজো বলেছেন, ভাগ্য আর শক্তি একসঙ্গে চলে। ভাগ্যের উদয় হলে শক্তি সঞ্চয় করতে হয় আর ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করতে গেলেও শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। তার এ কথায় সঙ্গে মারকিন মাফিয়াদের সারাৎসার মিলে যাবে। গডফাদার যখন চলচ্চিত্রে রূপ নিল তখন তাতে নীলচক্ষু সেই মারকিন ফ্রানক সিনাত্রাও অভিনয় করেছিলেন। সিনাত্রা সম্পর্কে মারকিন তথ্য ও প্রচার মাধ্যম একবার বলে-ছিল মাফিয়ার সঙ্গে নাকি এই অধঃপতিত গায়কের রীতিমত যোগাযোগ আছে।

ফ্রানক সিনাত্রা গায়ক হিসাবে বেশ উঁচু-দরেরই লোক ছিলেন। কিন্তু ভালো গান জানলেই তো আর নাম করা যায় না। মারকিন মাফিয়াদের পালের গোদা লাকি লুসিয়ানোর সঙ্গে সিনাত্রার যোগাযোগ ঘটে যায়। তিনি সিনাত্রাকে প্রচুর টাকা দেন। সেই টাকার জোরে রেডিও, টি ভি আর কাগজপত্রে ব্যাপক প্রচার চালালেন সিনাত্রা। কিন্তু লাকি লুসিয়ানো তো আর এমনি এমনি টাকা দেননি তাকে।

১৯৪৬ সালে হাভানার কসা নসত্রায় 'সিনাত্রা নাইট' এ এই গায়ক গান গাইলেন। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লাকি লুসিয়ানো, অ্যালবারট, আনাসতাসিয়া, ফ্রানক কসতেললো এবং জো অ্যাডোনিস। এরা সকলেই এক একজন মাফিয়া-সর্দার। এই সর্দারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাদেরই ট্রেজারার মেয়ার লানসকি। আবার অনেক মারকিন সাংবাদিকই বলেছেন, প্রেসিডেনট কেনেডির সঙ্গে নিচু সমাজের বাসিন্দাদের মধ্যে দূতিয়ালীর কাজ করতেন সিনাত্রা। এটা সেদেশের রাজনীতিতে একেবারে অসম্ভব নয়। ১৯৬১ সালে তৎকালীন অ্যাটরনি জেনারেল রবারট কেনেডি চেয়েছিলেন মাফিয়াদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান চালাতে। কিন্তু বাদ সাধলেন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটি-গেশনের তৎকালীন ডিরেকটর হুভার। তিনি বললেন, 'মাফিয়া বলে কিছু নেই—ও সব পেপারব্যাক লেখকদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাপার।'

হলিউডে সিনাত্রার নিজের একটি গোষ্ঠী ছিল। তার মধ্যে ডিন মারটিন, সামসি ডেভিস এবং টনি কারটিসের মতো অভি-নেতারা ছিলেন। এই ডিন মারটিনের নাকটা আসলে ছিল প্লাসটিক সারজারি করা। একবার তিনি সিনাত্রার একটি অপকর্মের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। তাতেই তাকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হলো : পুরনো নাকটি যদি ফিরে পেতে না চাও তবে বেগরবাঁই করো না।

আরও একটা ঘটনা বলা যাক। সেট ১৯৭১ সালের কথা। বিখ্যাত এক মাফিয়া কর্তা যোসেফ কলমবো একবার আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। তখন তার শয্যা পাশে যে ব্যক্তিটি পুলিশের নজর এড়িয়ে সবচেয়ে আগে হাজির হলেন তিনি হলিউডের প্রখ্যাত গায়ক সামসি ডেভিস।

লাস ভেগাস, কালিফোরনিয়া, নিউ ইয়রক, ফ্লোরিডা প্রভৃতি বড় বড় শহরের থিয়েটার আর নাইট ক্লাবের জলসায় অংশ না নিলে কেতা বাড়ে না। আর এই সব অনুষ্ঠান কেন্দ্রের মালিক মাফিয়ারা।

কিন্তু মাফিয়ারা এই সাংস্কৃতিক ব্যাপারে এত আগ্রহী হয়ে উঠল কেন? ১৯২০ সাল নাগাদ মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাইট ক্লাবে মদ

বিক্রি নিষিদ্ধ হয়। তখন চোরাই পথে সেখানে ঢালাও মদ বিক্রি শুরু হয়ে যায়। আর যেসব শিল্পীদের তারাই মদৎ দিয়ে বড় করে তুলেছে তাদের এনে আসর জমাতে তাদের কোন বাধা ছিল না। ফলে আরও লোক আসত, আরও মদ বিক্রি এবং আরও মুনাফা।

পরে ১৯৩০ সাল নাগাদ চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোটাই প্রায় মাফিয়াদের হাতে চলে যায়। তারা একে একে কিনে নেয় ওয়ারনার ব্রাদারস, মেটরো গোলডউইন মেয়র এবং কলমবিয়া পিকচারসের মত বাঘা প্রতিষ্ঠানগুলিও।

ওয়ারনার ব্রাদারসের নয়া মালিক জন রোজেলির সঙ্গে আবার যোগাযোগ ছিল সি আই এ কর্তাদের। অনেকের অনুমান প্রেসিডেনট কেনেডির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এর হাত ছিল। কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাসত্রোকে হত্যার ব্যবস্থা করার জন্য ইনি লুকিয়ে একবার হাভানায়ও ঢুকেছিলেন। কিন্তু এমনই দুঃখের ব্যাপার, ১৯৭৬ সালে এই ভদ্রলোককেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল মিয়ামি বীচের ওপর। মারকিন প্রেসিডেনট কেনেডি এবং নিগ্রো নেতা মারটিন লুথার কিং এর হত্যা ব্যাপারে মারকিন অনুসন্ধান কমিটির সামনে হাজির হয়েছিলেন জন রোজেলি। কিন্তু কয়েকজন লোক এসে একটু ঘুরে আসি বলে তাকে নিয়ে বেরোয়, তারপর আর জীবিত দেখা যায়নি ভদ্রলোককে।

শুধু সিনেমা কোমপ্যানির মালিকই নয়, সিনেমা কর্মীদেরও একটা সংগঠন আছে মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে। এর নাম ইনটার-ন্যাশনাল অ্যালায়েনস অব থিয়েট্রিক্যাল স্টেজ এমপ্লইজ অ্যানড মুভিং পিকচারস অপা-রেটরস। সিনেমা হলের মালিকরা কোন-রকম এদিক ওদিক করলেই এই ইউনিয়নটি ধর্মঘটের ভয় দেখায়। আর সেদেশের চলচ্চিত্র কর্মীদের এটিই সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন।

সিডনি কোরস্যাককে হলিউডের গড-ফাদার বলা যায়। নিউ ইয়রক টাইমস একবার এই সিডনি কোরস্যাক সম্পর্কে বিরাট একটা লেখা ছেপেছিল। হলিউডের চলচ্চিত্র সাংবাদিক শ্রীমতী জায়স হাবের একবার লিখেছিলেন, 'সমাজে গণ্যমান্য হিসেবে সবচেয়ে তালেবর হলেন সিডনি কোরস্যাক। তার বড়দিনে দেওয়া পারটি যদি আপনার কারড না পাঠায় তবে বুঝতে হবে আপনি নিতান্তই একটি ফেকলু'। আর এই সিডনি কোরস্যাকের প্রিয় বন্ধুদের অন্যতম হলেন গডফাদার ছবির প্রযোজক রবারট ইভানস, অন্যান্যরা হলেন অভিনেত্রী দীনা শোর, ডিন মারটিন, ডেভিড জানসেন ও বেনলডস। এরা সকলেই গায়ক অথবা অভিনেতা। মারলোন ব্রানডো অবশ্য মারিও পুজোর ব্যক্তি-গত বন্ধু। কিন্তু গডফাদারদের সঙ্গে তার যোগাযোগ কতটুকু তা বোঝা যায় না।

সিডনি কোরস্যাক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে টাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। বিশেষ করে ডেমোক্রেটিক পারটির সঙ্গে তার খুব দহরম মহরম। ১৯৩০ এর সময় কোর-স্যাকের কাজ ছিল ওকালতি। মাফিয়াদের বিরুদ্ধে একবার মামলা উঠেছিল যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে ফিলম কোমপানির কাছ থেকে টাকা খাচ্ছে। মামলা চলার সময় ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশনস রিপোরট দিল : আমাদের কাছে খবর আছে, আইন-জীবী সিডনি কোরস্যাক লুকিয়ে শিকাগো গ্যাং-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর ১৯৭৬ সালে মারকিন বিচার ব্যবস্থার কর্তাব্যক্তিরা রিপোরট দিয়েছেন : দেশের অন্ধকার রাজত্বের এখন সম্রাট হচ্ছেন সিডনি কোরস্যাক। এই সিডনি কোরস্যাক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন ফ্রানক সিনাত্রা থেকে এককালীন ভাইস প্রেসিডেনট স্পিরো অ্যাগনিউর সঙ্গে পর্যন্ত।

রাজনীতিতে হাওয়া গরম রাখার জন্যেও মাফিয়ারা টাকা যোগায়। যেমন মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাদা-কালোর বিভেদ টিকিয়ে রাখা। বছর পঞ্চাশেক আগে প্রথম যখন কু ক্লাকস ক্লান কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল তখন এর সঙ্গে মাফিয়াদের তেমন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এখন সেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই অবস্থা আর নেই। কু ক্লাকস ক্লানের লোকজন আগাপাশতলা সাদা কাপড়ে নিজেদের ঢেকে



প্রকাশ্য রাস্তায় খুন : কু ক্লাকস ক্লানদের কে বোঝে সেটি

নিয়ে যমদূতের মত কৃষ্ণাঙ্গ এলাকায় হাজির হয়। যে ঘোড়ায় চড়ে তারা আসে সেই ঘোড়াগুলোও সাদা কাপড়ে মোড়া থাকে।

কু ক্লাকস ক্লানের সদস্যসংখ্যা আর আগের মতন নেই। কারণ ওসব রাজনীতির ঝক্কি ঝামেলায় না গিয়ে অনেকেই এখন নিরাপদ গুণ্ডা বদমাইশির দিকে ঝুঁকেছে। যাই হোক, কু ক্লাকস ক্লানদের আবার তিনটি গোষ্ঠী আছে। সেগুলো (১) বিল উইলকিনসনের দল (২) রবারট সেনটনের দল (৩) ডেভিড ডিউকের দল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদস্য আছে রবারট সেনটনের দলে। সেনটনের বয়স ৫০। আগে গাড়ির টায়ার বিক্রিবাটা করত। এখন সে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মস্তানি করছে দলবল নিয়ে। তার দলে আছে তিন হাজারের মত সদস্য। সকলেই রিভলভার-ধারী। সেনটনের বাড়ি টাসকালুসায়।

আবার বিল উইলকিনসনের দলের সদস্য সংখ্যা আড়াই হাজার হলেও তার দাপট সাংঘাতিক। নিজের প্লেনে চড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় সে আর নিগ্রোদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের উস্কানি জাগিয়ে বক্তৃতা দেয়। এই বিলকে ক্লানের লোকেরা 'মুকুটহীন সম্রাট' বলে উল্লেখ করে। শেষ গোষ্ঠী অর্থাৎ ডেভিড ডিউকের গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ২ হাজারের মতন। ৩২ বৎসর বয়স্ক এই নেতা ছিল লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুএট। লেখাপড়া জানা ছেলে বলে মধ্যবিত্তদের মধ্যে তার প্রভাব বেশি।

মাফিয়াদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এরা দেশ-জুড়ে মারদাঙ্গা করে বেড়ায়। ৩৬ বৎসর বয়স্ক ইলেকট্রিকের প্রাক্তন ঠিকাদার বিল উইকিল-সনের সোজা কথা হচ্ছে : শুধু কেলে মানুষ-গুলোকে ঘেন্না করাই আমাদের কাজ নয়। আমরা ঘেন্না করি ইন্দোচীনের যত উদ্বাস্তু, রেড ইনডিয়ান আর হিসপানিদের। স্টেট ডিপারটমেনট গত বছর এদের কুকীর্তির ৪৪টা ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। তার মধ্যে আছে এরকম ঘটনা : একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা জনৈক কৃষ্ণাঙ্গের প্রেমে পড়েছিলেন। ক্লানের লোকজন এসে একদিন মহিলাটিকে বাড়ি থেকে টেনে বার করল এবং বেত মারতে মারতে তাকে খতম করল। আশেপাশের শ্বেতাঙ্গরা শুধু বোবা হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঘটনা দেখল।

কমিউনিসট ওয়ারকারস পারটি গ্রীনস বরোতে বর্ণান্ধতার বিরুদ্ধে একটি মিছিল বের করেছিল। ক্লান সেই মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে চারজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে হত্যা করে। তাছাড়া বারমিংহামে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তারা নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির দুজন কৃষ্ণাঙ্গ নেতাকে হত্যা করে এবং নিগ্রোপল্লীর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

ক্লানরা অনেক সময়ই বাচ্চাদের মধ্যে



নিউইয়র্কের রাস্তায় খুনোখুনি : হিংসা নিয়ে গণ্ডগোল

'হিংসার প্রচার' চালায়। কারণ তারা মনে করে বাচ্চাদের ঘেন্না জাগানো অনেক সহজ আর ছোট বয়স থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ঘেন্না করতে শেখালে কাজ অনেক সোজা হবে। একবার ইসকুলে লিফলেট ছড়ানো : 'কেলেদের জন্যে তোমরা কি হতাশ হচ্ছ? হবে নাই বা কেন? এইসব বদখত্ কেলেরা কি জেল ভেঙে পালায়নি? তোমাদের জামা কাপড় চুরি করেনি? বাসনপত্র হাপিশ করেনি?' লিফলেটে তাই সমাধান দেওয়া হচ্ছে : 'এস, ভিড়ে পড় আমাদের ক্লান ইউথ কোরসে। এটা কু ক্লাক্স ক্লানেরই যুব সংগঠন।'

এই যুব সংগঠনের প্রকাশ্য শিক্ষাশিবির ডাকা হয়েছিল জেফারসন কাউন্টিতে। গ্রীষ্মকালীন এই শিবিরে নাইটদের মত আলখাল্লা পরা ক্লানরা দশ থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে হয় শিখিয়েছে। আর শ্বেতাঙ্গরা যে কী সাংঘাতিক অভিজাত তাও এই শিবিরে বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষা বৃথা যায়নি। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে কোন আলাদা ইসকুল থাকবেই না, এই নীতির বিরুদ্ধে সদ্যদীক্ষিত ক্লানরা আলবামার ডিকাটুরের কাছে একটা স্কুল বাস দাঁড় করায় এবং পুড়িয়ে দেয়। আশে পাশের বড়রা পর্যন্ত সেই আগুন দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ে। বাসের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরাই ছিল বেশি। না, তারা অবশ্য পুড়ে শেষ হয়ে যায়নি। তবে আহত হয়েছে অনেক শিশুই। আর এটা ঘটেছে শিশুবর্ষেই। তবে শিশুবর্ষে কালো শিশুদের জন্যেও ভাবনাচিন্তা করা হবে কিনা তা অবশ্য বলা হয়নি।

জাপানী ইয়াকুজাদের যিনি ওয়াবুন তিনিই মারকিন মাফিয়ার কাছে হয়ে পড়েন গডফাদার অর্থাৎ ধম্মবাবা। এই ধম্মবাবাটি বড় সাংঘাতিক। তিনি পারেন না এমন কাজ নেই। আর সেই জন্যেই তার নিজের জীবনও সব সময় ট্রাপিজের দড়ির উপর।

এইরকম একজন ধম্মবাবার নাম কারমাইন গালানটে। এই গালানটের কাজ ছিল সিগারেট পাচার করা। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে সিগারেটের কোন নির্দিষ্ট দাম নেই। এখন এক প্যাকেট সিগারেটের আবগারী শুল্ক দেখুন : নরথ ক্যারোলিনায় ২ সেনট, ভারজিনিয়ায় আড়াই সেনট, কনেকটিকাট, ফ্লোরিডায় ২১ সেনট, নিউ ইয়রক সিটিতে ২৩ সেনট।

৯৫ নং হাইওয়ে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের সংযোগ ঘটিয়েছে। এই হাইওয়ের পোশাকি নাম টোব্যাকো রোড। মানে এই রাস্তা ধরেই অবাধে সিগারেট পাচার হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা চলে যায়। গালানটের দল দক্ষিণ থেকে সিগারেট কিনে উত্তরে বিক্রি করে। কারণ উত্তরের শহরগুলিতেই আবগারি শুল্ক বেশি। পুলিশ জানে কিন্তু কিছু বলে না।

কেন বলে না? এ ব্যাপারে মারকিন বিচার বিভাগের জনৈক ব্যক্তির মতে, 'আমরা ওদের সম্পর্কে যতটুকু জানি, ওরা আমাদের সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে।' এই অসহায়তা সব সময় আন্তরিক মনে হয় না।

এই তালেবর গালানটে গতবছর জুলাই মাসে হঠাৎ খুন হয়ে গেল জো অ্যানড ম্যারিন রেসটুরেনটের পেছনের গলিতে। পুলিশ বলেই ফেলল, এরপর শুরু হয়ে যাবে সিরিজ অব মারডারস। আর হলও তাই। পরপর খুন হল তিনজন। আগেও একবার এইরকম এক ধম্মবাবা জো গ্যালো খুন হবার পর ষোলটা লাশ হাপিস হয়েছিল। সবার কপালের বাঁদিক ঘেঁসে পাওয়া গেল ছোট-ক্যালিবারের বুলেট।

গালানটে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি শর্তাধীনে কদিনের জন্য ছাড়া পেল। এরকম অবস্থায় পুলিশের রাতদিন ওয়াচ থাকার কথা তার ওপর, ছিলও। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধম্মবাবার প্রাণটি গেল। কেন, কেউ বলতে পারে না।

গালানটে মারা যাবার পর আত্মীয়স্বজন তাকে দেখতে এল দলে দলে। কেউ ক্যাডিলাক চেপে, কেউ বা লিমুসিনে। পুলিশ সব গাড়ির নমবর টুকে রাখল। কিন্তু দেখা গেল এ নিয়ে আর একচুলও তদন্ত হল না।

পুলিশ দুই চেনাজানা মস্তানকে খুঁজছিল। কারণ ঐ দুজন গালানটে খুন হবার সময় তার সঙ্গে বসেই খাওয়াদাওয়া করছিল রেসটুরেনটে। কিন্তু দুদিন পরে ওরা উকিল নিয়ে কবুল করে গেল, ঐদিন তারা গালানটের সঙ্গে ছিলই না, দেখেনি ওসব খুনটুন কিছু।

আসল কথা গালানটে জেলে যাবার পরই তার নিজস্ব মাফিয়া পরিবারে কর্তৃত্ব নিয়ে গণ্ডগোল লাগে। আর তাতেই এই খুনোখুনি। ঐ একই পরিবারে গালানটের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রানক তিয়েরি। এখন সেই সর্বস্বীকৃত ধম্মবাবা।

ওয়াবুন আর গডফাদারের দল মোটামুটি ভাবে সমাজশিরোমণি। কেউ তাদের সোজাসুজি ধরতে পারবে না। কারণ গম্ভীর চালচলন, পয়সাঅলা এইসব কন্দর লোকেরা অনেককেই হাত করে রেখেছে।

মারকিন দেশে তোলা একটি চলচ্চিত্রে একবার সাধারণ একটি মানুষের জীবনগাথা বর্ণিত হয়েছিল। লোকটি শহরে এসেছে সবে, ভ্যাবাচাকা খাওয়া অবস্থা তার। এই কারণাই মহাকাব্যের আকারে মারকিন সমাজকে গ্রাস করছে। যেমন জাপানী চলচ্চিত্রের সেই শিশুটির কথা ভাবুন। যে তার বাবা মার পাপ ব্যবসায় অংশীদার কিন্তু পাপপুণ্যের সে বোঝে কী ছাই। তবু তার যেন কেমন এক ধারণা : পৃথিবীতে একজন মহামানব নেমে আসবেন যিনি উদ্ধার করবেন তাকে, তার সদ্যজাত ভাইটিকে, বাবাকে, মাকে।

মারকিন মুলুকে ইওরোপীয়ানরা যখন আসতে শুরু করে তখন কিছু রেড ইনডিয়ান ধরে তারা হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে। একজন তার মধ্যে পালিয়ে যায়। দলের প্রধান মৃগবাহিনীর ক্যাপটেনকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল, ওকে স্যার বেঁধে রাখা যায়নি, তাই গুলি করে মেরে ফেলেছি।

তারপর থেকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রই বলুন আর জাপানই বলুন, সভ্যতা অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু সেই আগন্তুকদের মত মাফিয়াদের স্বভাব বদলায়নি। যাকে তারা ধরে রাখতে পারে না তাকেই গুলি করে শেষ করে।

আর তাদের এক্তিয়ারে পড়ে সব ধরনের মানুষ—যাকে তাদের দরকার, কাজে লাগিয়ে দেয় তাকেই। এর কোন হেরফের নেই, ব্যত্যয় নেই।

শুধু নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষরাই সেখানে এক একজন আউটসাইডার, ভ্যাবাচাকা খাওয়া লোক। আর নাগরিক মাফিয়ারাই। কোথাও তাদের নাম মাফিয়া কোথাও ইয়াকুজা, কোথাও বা মাফিওসি। নামে কি আসে যায়? ★

ঘরোয়া

এত চিঠি আসছে যে তাল রাখা যাচ্ছে না সময়ের সঙ্গে। ফেবরুয়ারি মাসে পাওয়া চিঠি ছাপতে মে মাস হয়ে যাচ্ছে। ঠিক করেছি ঘরোয়া আসরে চিঠি ছাপবো প্রাপ্তির সময়ক্রম রেখে। তবুও অনেক চিঠি, বেশ ভালো চিঠি ছাপতে পারছি না। পত্রলেখকদের ধন্যবাদ তাদের সহযোগিতার জন্য।

এখন থেকে তাই এক সংখ্যায় কয়েকটি পুরো চিঠি ছাপবো, পরের সংখ্যায় ছাপবো অনেক চিঠির নির্বাচিত অংশ বা সারাৎসার। এইভাবে অনেক চিঠির স্বীকৃতি ঘটবে। আমার পক্ষ থেকে পরিবর্তনের সম্পাদককে সানুনয় অনুরোধ, দোহাই, ঘরোয়ার জন্য আর একটা পাতা দিন। আপনারাও লিখুন না! তাহলে আমার একক ক্ষীণকণ্ঠ একটু বল ভরসা পায়।

নতুন খবর: একজন পাঠক সত্যিসত্যিই ইংরিজিতে চিঠি দিয়েছেন এবং একজন বাচ্চা স্কুল পড়ুয়া পাঠিয়েছে ছড়া। দুটোই চমৎকার ও বিতর্ক প্রাসঙ্গিক। সামনের কোন সংখ্যায় বার হবে।

লজ্জাহীন মধ্যবিত্ত

অনেকদিন আমরা বিদেশী ভাষা এবং ভাবের দাসত্ব নিয়েছিলাম। ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শেকল এখনও আমাদের ঘাড়ে দাগ রেখে গেছে। ফলস্বরূপ হাজার হাজার বেকার, উচ্ছৃংখল বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান এবং অকার্যকর ডিগ্রী লাভ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের অগণিত জনসাধারণকে ইংরেজি ভাষার গণ্ডীর বাইরে রেখে, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য অপরাধ করে গেছে ইংরেজরা। আমাদের এই বিদ্যালাভ কখনই আমাদের মনের সঙ্গে হাত মেলায়নি।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর যখন ইংরেজদের সরিয়ে দেওয়া গেল দেশ থেকে, তখন দেখা গেল স্বার্থান্বেষী কুচক্রী কিছু নেতা মিথ্যাই ইংরেজ বিরোধী শ্লোগান দিচ্ছিলেন। বিদেশীদের হাতে নিজেদের ধুতির কোঁচা রেখে 'স্বাধীনতা' চিৎকার করে গেছেন। আসলে জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে ইংরেজদের ধাঁচে শোষণ করতে তাদের কালো থাবাও তৎপর। সেইসব ভণ্ড বিপ্লবীদের সহযোগিতায় যে ইংরেজি স্কুল বাড়বে, এ আশ্চর্যের কি।

লজ্জা জিনিসটা আমরা মধ্যবিত্তরা বিসর্জন দিয়েছি। সমাজের বিভিন্ন স্তরে আহত হয়ে মধ্যবিত্তরা জর্জরিত। লজ্জাবোধ গেছে উবে। কিন্তু নিজে কাক জেনেও ময়ূরের পালক গুঁজে ময়ূর সাজার চেষ্টাটা যায়নি। ধরা পড়ে যায় বারবার। ঘরে, বাইরে সর্বত্র। তবু লজ্জা নেই। একদিকে ইংরেজি স্কুলে দরাজ হাতে টাকা ঢালি। অন্যদিকে মাসের শেষদিকে কাবলিওয়ালার হাত চেপে ধরি।

কিন্তু চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে কেন এই ধরনের কাজকর্ম? কেননা, ছেলে স্মার্ট হবে, ডিসিপ্লিনড হবে, সর্বোপরি সহজেই তার বেকারত্ব মোচন হবে। হা রে মধ্যবিত্ত! কত চাকরি হবে? ধীরে ধীরে তো একটা পদের জন্যে একদিন কোটি কোটি প্রতিযোগী এসে দাঁড়াবে। তখন?

আর সত্যিই হয়তো রকে বসে বাংলার স্কুলের ছাত্ররা বেলেল্লাপনা করছে, এটা অন্যায়। কিন্তু আরও অন্যায় করছে বিদেশী অনুকরণপ্রিয় ঐ সব স্মার্ট, ডিসিপ্লিনড ছাত্ররা সমাজের মাথা হয়ে দশজনের খাবার একা নিয়ে, জনসাধারণের সামনে বড় বড় কথা বলে, আড়ালে মদ আর মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করে। কুচক্রী জননেতাদের এরাই মদত দিচ্ছে। নিজের আখের গুছোবার তালে থাকছে। কোনরকমেই জাতির সার্বিক উন্নতি তারা করে না—করতে পারে না। কেননা, এদের বিদ্যালোভ আত্মস্বার্থবিজড়িত। এর চেয়ে অপরাধ আর কি থাকতে পারে? বেকারাবস্থায় এরা চুরি, ছিনতাই করে না (মাথা পেতে অত্যাচার সওয়াই এদের পক্ষে স্বাভাবিক), কিন্তু শিক্ষিত ছিনতাইকারীদের নিয়ে সঠিক পথে সংগ্রামে চালনা করাও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে এ বিদ্যাশিক্ষায় কিসের এতো গর্ব?

যারা বলেন, দেশপ্রীতি বড় কথা নয়, যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলাটাই বড়, তাদের জন্য ইতিহাস ভয়াবহ শাস্তি তৈরি করে রাখবে। যে অসুস্থ মনোভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ ভুগেছেন এবং আজকের এই অশান্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, অবিলম্বে তা বন্ধ না করলে ভীষণ বিপদ হবে। দিনের পর দিন একমাত্র কেরানীর চাকরির উপযুক্ত—এমন বেকার বেড়ে যাবে। মাঝখান থেকে ইংরেজি শিক্ষার দোহাই দিয়ে কতক স্বার্থান্বেষী, দেশের জনসাধারণকে মজা করে শুষবে। সরকারী কাজে বাংলা ভাষা চালু করা সত্বেও কতক স্বার্থান্বেষী আমলা—যারা সেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত, তারা আবার ইংরেজিকেই টেনে আনবে।

অভিজিত সরকার, মুর্শিদাবাদ

পরিচালনা
নিবারন চক্রবর্তী

ক'জন বাবা-মা 'মানুষ'

পরাধীন তো আমরা সর্বত্র, তাহলে ইংরাজি স্কুল কি দোষ করল? ইংরাজি ভাষা শিখলে বা স্কুলে পড়লেই যে নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তি বিসর্জন দিতে হবে, তার কি কোন বাধ্যবাধকতা আছে? একেবারে ইংরাজি স্কুলেই পড়েনি অথচ সেই পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েরাও অতিথিকে বিদায় দেবার সময় 'টা' 'টা' জানাতে ভোলে না। আসলে আমরা নকল করতে ভালবাসি। তাই আমাদের সর্বাঙ্গে কৃত্রিমতা, আমরা সাজ পোশাকে ভিন দেশী। খাদ্যরুচিতেও আমাদের বাসনা নানা দেশের স্বাদ খোঁজে। ইংরাজি স্কুল আমাদের পরাধীন করেনি। প্রতি পদক্ষেপে আমরা পরাধীন। কেননা আমরা সব কিছু নিজস্ব স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে একটা প্রচণ্ড মানসিক অসুস্থতায় ভুগছি। মেধাবী ছেলে মেয়েরা যখন ভাল ইংরাজি স্কুলে পড়তে যায় তখন আমি নিন্দার কিছু দেখি না, কেন না তার জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের জন্য। স্মার্ট হবার জন্য সে যদি ইংরেজি স্কুলই বেছে নেয়, তাতে তো তার কর্ম জীবনের পথ প্রশস্তই হবে। আর ভালভাবে বেঁচে থাকতে তো সকলেই চায়, তখন যার যোগ্যতা আছে সে পড়ুক, ক্ষতি কি? দোষ তো স্কুলের বা টিচারদের নয়, দোষ আমাদের মত গারজিয়ানদের যারা প্রতিনিয়ত সমাজ জীবনে মানসিক দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য যেমন করে হোক একটা ভাল ইংরাজি স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে, তার ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করে তাকে 'মানুষ' করে তোলা। কিন্তু 'মানুষ' পদবাচ্য আজ ক'জন বাবা মা আছেন যে তারা আশা করবেন তাদের সন্তান 'মানুষ' হোক। আজ আমাদের মনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ ঢুকে গেছে, আমরা সুখী প্রতিবেশীকে ঈর্ষা করি, আত্মীয় দারিদ্র হলে তাকে স্বীকার করি না, সবাই ছুটছি একটা অন্ধ নেশায়, তার ফল ভাল কি মন্দ তা আমরা নিজেরাই জানি না। অক্ষম অনুকরণ বৃত্তি ও ঈর্ষাই এর মূল কারণ। সন্তানকে ভালবেসে আমরা তাকে মানুষ করার চেষ্টা করি না। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে ছেলে-মেয়েকে ইংরাজি স্কুলে দিতে তা সত্ত্বেও বাবা মা যদি ঠিকভাবে তাদের চালিত করেন তবে তারা কিছুতেই হাঁসজারুর দল বৃদ্ধি করবে না। এমন অনেক 'ফরেন' প্রত্যাগত ছেলে মেয়েকে জানি, যারা মনে প্রাণে ধর্মে কর্মে পুরো বাঙালী, তাদের ভিতিওই যে গড়ে উঠেছে

একটা আদর্শকে সামনে রেখে। অভিভাবকরা যদি নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ান তাহলে তো বলার কিছুই থাকে না। স্কুল নিয়ে তারা ব্যবসা চালাচ্ছেন বলে আমাদের ধারণা। আমরা তেমন স্কুলে ছেলেমেয়ে দেব কেন? আমরাই তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, তবেই না অন্যায় বেড়ে চলে! ব্ল্যাকমার্কেটই বলুন আর ঘুষ দেওয়াই বলুন সে তো আমরাই বাড়িয়ে চলেছি আমাদের আকাশছোঁয়া চাহিদার জন্য। তেমনি অসাধু উপায়ে যদি স্কুল চলে, আমরা সকলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করলেই সে উঠে যেতে বাধ্য হবে। শুধু কি স্কুলের ব্যাপারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত অভিভাবকগণ শোষিত হচ্ছেন? শোষিত হচ্ছে আজ সকলেই সর্বক্ষেত্রে। সুস্থ ও স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় যদি আমরা সর্বত্র দিতে পারি তাহলে ইংরেজি স্কুল পরাধীন করে রাখতে পারবে না কোনদিন। সে বলিষ্ঠ মনোভাব আমাদের কোথায়?

রমা গুপ্ত, হাওড়া-৩

আসলে ইউরোপীয় কুয়াশা

এটা বিশ শতকের আশির দশক, এবং আমাদের চারপাশে ইউরোপীয় আবহাওয়া। প্রশ্ন উঠেছে কেন? বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন! তবে উত্তর খোঁজার আগেই ছোট্ট একটি প্রশ্ন রেখে দিই। এ বিতর্কের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে'। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অর্থাৎ গোটা সমাজটাকে যে ইউরোপীয় কুয়াশা ঘিরে রেখেছে, তার জন্য পুরো দোষটা কি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়? 'হাঁসজারু'রা না হয় বেলট দিয়ে ধুতি পরে, কিন্তু বাংলা মিডিয়ামের ছাপ মারা আজকের বঙ্গসন্তানরা ক'জন ধুতি পরতে জানে? পাঁচটা কথা বলতে গেলে কেন তার মধ্যে দুটো ইংরেজি শব্দ এসে যায়?

আসলে ইংরেজি স্কুলটা উপলক্ষ্য মাত্র, ইংরেজি ভাষাটাই তার নীল রক্তের মানসিকতা নিয়ে গোটা সমাজটার ওপর পা তুলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন?

উত্তরটা রয়েছে, সেই উনিশ শতকের শেষভাগে বীজটা বোনা হয়েছিল তখনই এবং তার ফসল ফলছে আজ। শহরকেন্দ্রিক পাশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব উনিশ শতকের শেষাশেষি এ দেশের ওপর পড়তে শুরু করেছিল। এই প্রভাবের মূলে ছিল দুই প্রতিপক্ষের দুটো ভিন্ন উদ্দেশ্য। বৃটিশ তার শাসনযন্ত্রটি পাকাপোক্ত করার জন্য এ দেশে ইউরোপীয় আবহাওয়ার বিষ ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে সেকালের কিছু সচেতন মানুষ চেয়েছিলেন দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে এবং সেজন্য সবচেয়ে জরুরী ছিল সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। যাতে সে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। কারণ এ অবস্থা ছিল অবশ্যম্ভাবী, স্বাধীনতার পর যখনই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর পিছনে পিছনে এসে দাঁড়াল ক্ষমতালোলুপ রাজনীতি, তখনই এ দেশের ভবিষ্যৎটুকু স্থির হয়ে গেছে। অথচ আমরা সাবধান হতে পারতাম. বিশেষ করে যখন সেই উনিশ শতকেই ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের করণীয়ও বিশেষ কিছু নেই। ইংরেজি তুলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে দেশের ঐক্যের প্রশ্নটি জড়িত। এ দেশে হাজার রকম ভাষা, হাজার রকম সংস্কৃতি, হাজার রকম মানুষ। তাদের সবাইকে একটি বিন্দুতে নিয়ে আসতে গেলে একটি কমন মিডিয়ামের প্রয়োজন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনে এই মিডিয়ামের কাজটি করেছিল ইংরেজি ভাষা। এই আশির দশকে না আছে প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ, না আছে বৈপ্লবিক আদর্শ। কিন্তু যে জিনিসটি গোটা ভারতকে আজও জোড়াতালি দিয়ে টিঁকিয়ে রেখেছে, তা হল এই ইংরেজি ভাষা, তাই তাকে হঠাৎ আঙুল তুলে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া অসম্ভব। **সুপ্রিয় গোস্বামী, কলকাতা-৩৬**

ভিন্ন চোখে দেখুন

আমি বিষয়টিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখার পক্ষপাতী। আমি উগ্র ইংরেজি বিদ্বেষী নই আবার উগ্র বাংলাপ্রেমীও নই। আমার মতে বিষয়টিকে নীতি ও কৌশল এই দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। যেমন ইংরেজি শিক্ষাটা কোনমতেই নীতিগত ব্যাপার হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়। এটা হওয়া উচিত কৌশলগত প্রশ্ন। কারণ সর্বত্র বাংলা চালু করতে আমরা যদি ইংরেজি তুলে দিই বা ইংরেজি না পড়ি অর্থাৎ ইংরেজি স্কুলে না যাই তাহলে আমরা সারা পৃথিবীর শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞানচর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারব না। ভাববিনিময়ের সূত্র হারিয়ে ফেলব। এছাড়াও রুজি-রোজগার চাকরি-বাকরির সমস্যা তো রয়েইছে। এটা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা। আর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামতো মূল সংগ্রাম। পরাজিতের দল সকলের অলক্ষ্যে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যাবে। এটাই ডারউইনের তত্ত্ব। যাই হোক আজকের প্রয়োজনের জগতে ইংরেজি যখন শীর্ষস্থানে রয়েছে তখন ইংরেজি শিক্ষাটা আমাদের কাছে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের একটি কৌশল না হয়ে পারে না। অন্যদিকে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাটা আমাদের নীতিগত বিষয় না হয়েই পারে না। কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান। এই ভাষাতেই আমরা কথা বলি স্বপ্ন দেখি। দেশের মাটির সঙ্গে এ ভাষা সম্পর্ক যুক্ত। এই ভাষাকে অবজ্ঞা করার অর্থ এই মাটির সংগে সম্পর্ক হারানো। এই ভাষাকে ঘিরেই তো একদিন আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। আজ এ ভাষার প্রতি মমত্ব যত কমছে জাতীয় চেতনাও ততই কমছে। যে জাতির জাতীয় চেতনা নেই, সে জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা যখন তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপন্ন হতে পারে। কারণ তারাতো সাংস্কৃতিকভাবে পরাধীন হয়েই রয়েছে। অতএব বাংলা ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা হারানো এক বিপজ্জনক অবস্থার জন্ম দিতে পারে।

সুপ্রিয় দে, কলকাতা-৩৬

ইংরাজি স্কুল আমলা তৈরি করে

জনগণ মনোনীত মন্ত্রীমণ্ডলের সাহায্যে একটা দেশ পরিচালিত হয়। এদের স্থায়িত্ব পাঁচ বছর। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও কম এবং এরা উঠে আসেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। একটা বৃহৎ দেশ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালানোর মতো অভিজ্ঞতা বা মানসিক গঠন খুব কম লোকেরই থাকে। সাহায্য নিতে হয় সেক্রেটারি অথবা পারসোনাল এ্যাসিসটেন্টের। সরকার পরিবর্তিত হয় কিন্তু এরা বদলায় না। বছরের পর বছর এরা একইভাবে রয়ে গেছেন। এ্যাডমিনিসট্রেশন বিভাগটা সম্পূর্ণ এদের দখলে। প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসকগোষ্ঠী এরাই। আর মন্ত্রীরা হল এদের ক্রীড়নক। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এইসব আই এ এস অথবা ঐ জাতীয়রা বেশির ভাগই পড়াশোনা করেছেন কনভেন্টে। সাধারণ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা খুব কমই সুযোগ পায়।

দেখা যাক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কতোটা ওয়াকিবহাল করছে। চল্লিশ বছর পূর্বে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো দেশ স্বাধীন হবার পরেও একই অবস্থা রয়ে গেছে। তখনকার দিনে বৃটিশদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল কিভাবে সুকৌশলে একটা দেশের ওপর প্রভুত্ব খাটিয়ে দেশটাকে শোষণ করে ছিবড়ে করে দেওয়া যায়।

কাজেই কনভেন্টে পড়া এই সব শিক্ষার্থীদের মানসিক গঠনও সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত করা সম্ভব তার অনুকূলে বাহিত হবে। এইভাবে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ফলে দেশ স্বাধীন হবার পরেও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছি।

সমীর দত্ত, পুরুলিয়া

বাংলা ছবির গায়ে রক্ত সঞ্চারের জন্য আর একটি 'পথের পাঁচালী' চাই



নির্মল ধর

দেবকীকুমার বসুর জনপ্রিয়তা তখন মাঝ আকাশে, তার সৃজনশীল সমাজচেতনামুখী শিল্প প্রতিভা 'রত্নদীপ', 'পথিক' ছবির ব্যাপ্তিতে আছে ছড়িয়ে। আশপাশের নাটুকে ছিঁচকাদুনে 'বায়োস্কোপে'র ভিড়ে একমাত্র তিনিই জীবননিষ্ঠ বলিষ্ঠতায় দীপ্যমান। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে অবশ্যই তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত নন। 'নাটক' ধর্মের শিল্পরূপ অনেকেরই নাগালের বাইরে তখন। দেবকী বসুরও।

দর্শক ভোলানো গল্প বলা ছাড়া পঞ্চাশের দশকে টালিগঞ্জের প্রযোজক-পরিচালকরা বায়োস্কোপকে অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। নাটককেও সেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতেন। পারলে 'ছিন্নমূলে'র মত বলিষ্ঠ ছবি মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিতাড়িত হত না ছবিঘর থেকে। সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' এক মাসের বেশি স্থায়ী হত উত্তরা-পূরবী-উজ্জলা'য়। সুশীল মজুমদারের 'দুঃখীর ইমান' সাত দিনের মধ্যেই বিদায় নিত না দর্শকের চোখ থেকে।

পঞ্চাশের সেই দশকে কলকাতায় জমজমাট বাজার বসিয়ে ছিল ফ্যামিলি ড্রামার নামে সস্তা সেনটিমেনট, নারী আদর্শ, নিপাট ভাঁড়ামো, যুক্তিহীন পরিবেশে সুরেলা গান আর তারকা প্রথার রঙিন নেশা। স্টুডিওগুলোর একাধিপত্য তখন ভেঙে গেছে। নিউ থিয়েটারসের মুমূর্ষু অবস্থা। এম পি'র বাজার দর অবশ্য কিঞ্চিৎ চড়া।

১৯৫৪ সালে সফল ছবির তালিকায় জলজল করছে তখন অগ্নিপরীক্ষা, ষোড়শী, অন্নপূর্ণার মন্দির, সদানন্দের মেলা, ঢুলী, চাঁপাডাঙ্গার বৌ, নববিধান ছবিগুলো। ছবি না বলে টকি বলাই ভালো। পঞ্চান্ন সালের শুরুতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে গরীবের ছেলের প্রেম এবং তুরুপের তাস শরৎচন্দ্রের জয়জয়কার।

কলকাতার ছবিপাড়ায় কোন ঝড় নেই, আলোড়ন কোথাও চোখে পড়েনি। মাত্র দু' সপ্তাহ আগে হৈ-হৈ করে রূপবাণী-অরুণা-ভারতীতে চিত্ত বসুর 'কঙ্কাবতীর ঘাট' মুক্তি পেয়েছে। চলছেও রমরম করে। মিনার-বিজলী-ছবিঘর 'অংকুশে'র আঘাতে জর্জরিত। তপন সিংহের তৃতীয় ছবি 'উপহার'-এর অগ্নিপরীক্ষা চলছে। কারণ তার আগের বছর 'অঙ্কুশ' মুখ থুবড়ে মার খেয়েছে। এ ছবিতে আর তারুণ্যের আধিক্যের কোন পরীক্ষার ঝুঁকি নেননি তিনি। গল্প বলার বাঁধানো রাস্তায় এগিয়েছেন তপন সিংহ। রাধা-প্রাচী-ইন্দিরায় মানু সেনের 'বিধিলিপি'র ভাগ্য তখন স্থির।



বীণা-বসুশ্রী-শ্রী হল থেকে শৈলজানন্দের 'কথা কও' ছ' সপ্তাহের পর বিদায় নিচ্ছে সেখানে তখন আসছে এক নতুন তরুণ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। প্রযোজনা করেছেন রাজ্য সরকার, পরিবেশক অরোরা ফিলমস করপোরেশন। ২৬ আগসট সকাল থেকেই তাদের সকলের বুকে দ্রিমি দ্রিমি শব্দ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সবাই-ই নীরব।

সেই নবাগত তরুণ সত্যজিৎ রায় ভাবতেই পারছেন না তার স্বপ্নের ছবি সত্যিই ২৬ আগসট মুক্তি পেতে চলেছে। উত্তেজনায় তিনিও চঞ্চল। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান, অনেক গঞ্জনার ফসল এই 'পথের পাঁচালী'। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তিনি তিন বছর ধরে ছবিটাকে তৈরি করেছেন। কেন ? সৃষ্টির যন্ত্রণাই তো এরকম ! পরিচিত বন্ধু, সাংবাদিক বহু লোকই এসেছেন সন্ধ্যার 'শো'-তে।

ছবি শেষ হবার পর সকলেই কেমন যেন বাকহারা, স্তব্ধ। নতুন এক জগতকে বুঝি



আবিষ্কার করলেন সবাই। এ কি ছবি? নাটক নেই, হাসি মস্করা নেই, গালগল্প নেই! জীবনের একবুক দুঃখ আর বেদনা একবারে জীবন্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত। কি নিখুঁত ডিটেলসের কাজ!

প্রথম বর্ষার জলে দুর্গার স্নান, কাশবনের মধ্যে দিয়ে দু' ভাইবোন অপু-দুর্গার রেল লাইন দেখতে যাওয়া, তেল চুরি করে আম-মাখা খাওয়া, দুর্গার মৃত্যু, সর্বজয়ার অসহায়তা, হরিহরের শূন্যে স্বপ্ন দেখা এবং শেষ পর্বে কুলুঙ্গির ভেতর থেকে দুর্গার চুরি করা হারটির মাটিতে পড়ে যাওয়ায় অপুর বুকটা যেমন দিদির প্রতি মমতায় বেদনায় মুচড়ে ওঠে, দর্শকরাও তখন একবুক যন্ত্রণা নিয়ে ডুকরে উঠেছেন।

প্রথম শোতে 'পথের পাঁচালী' দেখার অভিজ্ঞতা শুনছিলাম একজন প্রৌঢ়ের কাছে। তিনি বললেন—'প্রথম দিন প্রথম শোয়ে ছবি দেখে যখন বেরোচ্ছি তখন আশপাশের কোন কিছুই যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। অপু আর দুর্গা আমার শরীর, আমার চেতনায় আচ্ছন্ন। কেমন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরেও সম্বিৎ আসেনি। চুপচাপ বসেছিলাম প্রায় ঘন্টাখানেক। বাড়ির লোকজন বুঝতে পারছে না আমার কি হয়েছে! তারা আমায় জিগ্যেস করতে আরম্ভ করল—কিরে, কি হয়েছেটা কি? অমন করে মুখ বুঁজে আছিস কেন?'

'ঘোর কাটতে দুদিন বাদে আবার ছবিটা দেখলাম। মনে হল ছবির সংজ্ঞাটাই যেন পালটে গেল। গ্রাম জীবনের সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই, বড় হয়েছি শহরে। কিন্তু অপু-দুর্গার একবারে কাছের মানুষ হয়ে যাচ্ছি যেন আমি! অন্য এক জীবন ও সত্য যেন আমার কাছে ধরা দিচ্ছে। সুতরাং, আবার, আবার, আবার দেখলাম 'পথের পাঁচালী'। মাথার ভেতর, বুকের কাঁপুনির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু দৃশ্য, সর্বজয়ার নারকেল চুরি…'

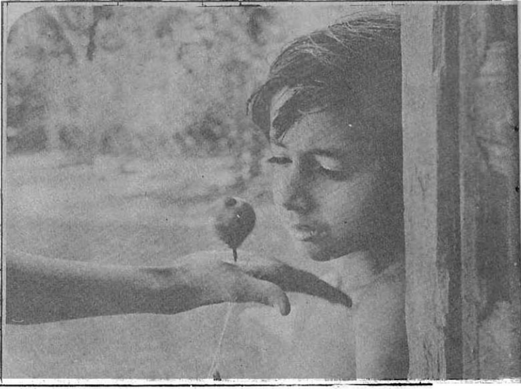
শুধু এই একজন দর্শকই নয়, সারা বাংলার প্রত্যেকটি দর্শক অভিভূত। 'পথের পাঁচালী' বাংলা ছবির গতিটাই দিল বদলে। দর্শককে এই অভিভূত করার পেছনে রয়েছে অমানুষিক ধৈর্য, সংযম, বলিষ্ঠ প্রত্যয়। সেই ইতিহাসও কম রোমাঞ্চকর নয়।

শুরু থেকেই 'পথের পাঁচালী'র গতি ছিল ভিন্ন। ডি জে কিমার কোমপানিতে আর্ট ডিরেকটর থাকার সময়েই সত্যজিৎ রায় অবসর সময়ে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীকে চিত্রায়িত করেছেন কাগজে, কাগজে। প্রতিটি দৃশ্যের ফ্রেমিং তার তুলির ডগায় ছিল তোলা। কিন্তু বিভূতিভূষণকে তিনি যে সর্বত্র আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেছেন তাও নয়। সেই তখন থেকেই তাঁর উপলব্ধি ছিল চলচ্চিত্র মাধ্যমটি একবারে অন্য চরিত্রের মিডিয়ম। তাই চিত্রনাট্য লেখার সময় ভিসুয়ালসের কথা মনে রেখেই স্বাধীনতা নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। তিনি নিজেই বলেছেন—'I chose 'Pather Panchali' for the qualities that made it a great book; its humanism, its lyricism, and its ring of truth. I knew I would have to do a lot of pruning and reshaping ..'

করেছিলেনও তাই।

কিন্তু কোনো প্রযোজক তো সেই চিত্রনাট্যে ছবি করতে রাজি নয়। কল্পনা মুভিজ নামে একটি সংস্থা এগিয়ে এসেও পিছিয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা সত্যজিৎ রায়ের মত এক নব্য তরুণকে দিয়ে ঐ ছবি করাতে রাজি নন। এরপর আরও একাধিক দরজা ঘোরা হয়ে গেছে। সবাই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারকা প্রথার শিকার হয়েছেন। ভাবটা এমন—এই ছোকরা আবার ছবি করবে কি।

শেষ পর্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যজিৎ রায় ঠিক করলেন নিজের জীবন বীমার পলিসি জমা দিয়ে ঋণ নেবেন। নিলেনও। কিন্তু



সে আর কত টাকা ? মাত্র সাড়ে সাত হাজার, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে হাত পেতে পেলেন দু' হাজার—মোট সাড়ে ন' হাজার টাকা হাতে এল।

শুটিং-এর লোকেশন হিসাবে দুটো জায়গা আগেই দেখে রেখেছিলেন। একটা দূরে, একটা কাছে। ১৯৫২ সালের বিজয়া দশমীর দিন গাড়ি নিয়ে সেই দূরের লোকেশনে তিনি হাজির। সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ জন লোক—ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র, প্রোডাকশনের অনিল চৌধুরী, আরট ডিরেকটর বংশী চন্দ্রগুপ্ত। আর ছিল দুটো ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সুবীর ব্যানার্জি, রুনকি ব্যানার্জি—অপু আর দুর্গা।

কাশবনের মধ্য দিয়ে তাদের ছুটতে বলা হল, কোন রিহারসাল নেই, কিচ্ছু না। অপু আর দুর্গা ছুটতে আরম্ভ করল। সুব্রত মিত্রের হাতে 'ওয়াল' ক্যামেরায় উঠল 'পথের পাঁচালী'র প্রথম দৃশ্য। এরপর ঘরের কাছের লোকেশন—বোড়ালে শুটিং। বংশীবাবু সেখানে একটা বাড়ি পছন্দ করলেন। ভাঙাচোরা বাড়িটাকে আরও ভাঙচুর করে সাজালেন হরিহর সর্বজয়ার সংসার হিসাবে। বারান্দা, রান্নাঘর, হাঁড়ি-কড়া-উনুন—সব নিখুঁত ভাবে তৈরি হল।

কিন্তু সাড়ে ন' হাজার টাকায় ক'দিন আর শুটিং করা যায় ? চার রীল তোলার পর টাকা শেষ, ছবির কাজ বন্ধ। এরই মধ্যে সত্যজিতের স্ত্রী বিজয়া রায় ইউনিটের খাবার যোগাড়ের জন্য বিয়ের বালা দুটি পর্যন্ত একদিন বন্ধক দিয়ে বসে আছেন ! কেউ জানে না।

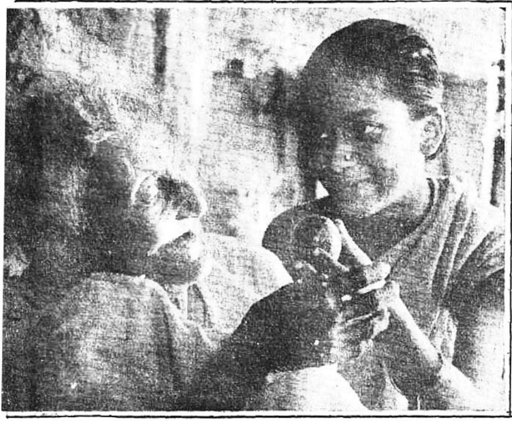
এরপর ? কোন আলোর দেখা নেই।



অফিসের ফাঁকে ফাঁকে চৌরঙ্গীর কফি হাউসের আড্ডায় বসেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ফিলম নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে। চায়ের কাপের বন্ধুরা সবাই-ই জানতেন সত্যজিৎ নিজে ছবি করছেন। টাকার অভাবে সে ছবি বন্ধ সেটাও অজানা ছিল না। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী সত্যেন রায়ের সঙ্গে। তিনিও সব ঘটনা জানতেন। এই সত্যেন রায়ের মারফতই অর্ধসমাপ্ত 'পথের পাঁচালী'র খবর গিয়ে পৌঁছায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কাছে। রাজ্য সরকারের তথ্য দফতর তখন সাংস্কৃতিক জগতের প্রসারের পরিকল্পনা নিয়েছেন। লোকরঞ্জন শাখা তৈরি হয়ে গেছে, উদয়-অমলা শঙ্করকে নিয়ে অ্যাকাডেমি অফ ডানস ড্রামা ও মিউজিক বিভাগ খোলা হচ্ছে। ঠিক সেই সময় এই ফিলমে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব আসতে বিধান রায়, তথ্য দফতরের সচিব পি এস মাথুর দুজনেই উৎসাহিত বোধ করেন। শ্রী মাথুরের বাড়িতে একদিন তারা দু/তিন রীলের সেই ছবিও দেখলেন। সকলেই মোটামুটি রাজি ও একমত যে 'পথের পাঁচালী'র আর্থিক দায়িত্ব রাজ্য সরকার নেবেন।

কিন্তু সরকারী লালফিতের ফাঁস কি এত সহজেই খোলে ! সত্যজিৎ তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ সরকারী টাকা পেতে। এর আগে ব্যবসায়ী প্রযোজক ও দালালদের কাছে গিয়ে তিনি অনেক ঠকেছেন। এমন কি এক দালালের হাতে ঘুষের টাকা দিতে গিয়ে নিজের অনেক সাধের দুর্মূল্য আরটের কিছু বই জলের দামে বিক্রি করে ফেলেছেন।

আইন বিভাগ, অর্থ বিভাগের অনুমতি পাবার পর হঠাৎ দেখা গেল—একজন সরকারী আমলা আপত্তি তুলেছেন। তার মতে 'পথের পাঁচালী' গ্রামের মানুষের দারিদ্র আর দুঃখের কথাই শুধু বলছে। রাজ্য সরকার যে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছেন—তার একটি শব্দও সারা গল্পে কোথাও নেই। সরকারী টাকায় তোলা ছবি যদি সরকারী পরিকল্পনাকে মদত না দেয়, উলটে হতাশাকে দেখাতে চায় সে ছবিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কেন ? নির্বোধের মত তিনি নাকি আরও বলেছিলেন 'পথের পাঁচালী' একটা অপয়া অলক্ষুণে ছবি।



'অপু' এখন কোথায় ? কী করছেন ?

বিশেষ প্রতিনিধি

দিদির সঙ্গে কাশবনে দৌড়ানো কিংবা ঝড়ের বিকেলে মুখুজ্জে বাড়ির আমবাগানে রৈ রৈ করে আম কুড়নো অথবা কালবৈশাখীর প্রথম বৃষ্টিতে সবুজ পাতার তলায় দাঁড়িয়ে—

'নেবু পাতায় করমচা
এই বৃষ্টি ধরে যা।'

আবৃত্তি করার বয়স 'দুর্গা' বা 'অপু' কারুরই নেই। 'দুর্গা' পুরোদস্তুর গিন্নী হয়ে গেলেও 'অপুর' জীবনসংগ্রাম এখনও চলছে বলা যায়। থাকেন কুদঘাটে। কারখানায় ভোরের ডিউটি থাকলে সক্কালবেলা প্রথম বাস ধরে ঘুমচোখে ছুটতে হয় দমদমের দক্ষিণদাড়িতে। বার্ড কোমপানির কারখানা, ন্যাশনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তার খাঁড়া ঝুলছে মাথার ওপর।

অবশ্য সে জন্য 'অপু' অর্থাৎ সুবীর ব্যানার্জি মনমরা নয় মোটেই। এখন সে নিপাট যুবক। ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। বাবা রিটায়ার করেছেন, দাদার ব্যাংকে চাকরি, মোটামুটি সচ্ছল-ই সংসার। বিয়ের কথা এখনও ভাবেননি। আগে দাদার বিয়ে হোক। দাদা-ভাইয়ে খুবই ঘনিষ্ঠতা !

বোড়ালে শুটিং করতে যাওয়ার সময়ও নাকি সুবীরের একই বায়না ছিল। ওর মা বলছিলেন 'দাদা না গেলে কিছুতেই ও শুটিংয়ে যেতে চাইত না।' আমাদের আলোচনার মাঝে বাবা শান্তিময় ব্যানার্জি ও মা দুজনেই এসে বসেছিলেন। বেশ উৎফুল্ল লাগছিল ওদের দুজনকে। ছেলের খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা ওরাও আপন করে নিয়েছেন। শান্তিময়বাবু বললেন 'ছবি করার সময়ই সত্যজিৎবাবু বলেছিলেন আপনার ছেলে এই ছবিতে কাজ করে সারা পৃথিবীতে নাম করবে। পথের পাঁচালী স্কুলে পাঠ্য হবে। তাই-ই হলো। ওর দূরদর্শিতা অসাধারণ।'

কয়েক বছর আগে সুবীর একবার গিয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের কাছে। চেহারার বদল হয়েছে তখন অনেক। কিন্তু তিনি দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন 'এই দ্যাখো, কে এসেছে চিনতে পারো ?' ছেলে সন্দীপ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, চিনতে পারেনি।

সেদিন ওর কাছে অভিনয়ের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করতেই সত্যজিৎবাবু নাকি বলেছিলেন—'না, না এ লাইনে এসো না। কি হবে ? অনেক ঝামেলা।'

অথচ 'পথের পাঁচালী' রিলিজ হবার পর কতই না অফার এসেছে। তখন সুবীরের বাবা-মা পড়াশুনোর কথা ভেবে ছেলেকে ফিলমে আসতে দেননি। আর সুবীরেরও তখন ঝোঁক ছিল খেলাধুলোয়। স্কুলে, স্কুলের বাইরে সে ট্রফি কুড়িয়েছে প্রচুর। ফিলমের 'গ্লামার' বস্তুটি তার মাথায় ঢোকেনি একফোঁটাও। বিমল রায় চেয়েছিলেন সুবীরকে। কয়েক বছর আগে তরুণ মজুমদারও নাকি 'বালিকা বধূ' ছবির জন্য ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নানা কারণে সে অফারও নিতে পারেনি সুবীর।

অবশ্য সে জন্য কোন দুঃখ নেই সুবীরের। এখনও যে ফিলম তাকে খুব টানে তাও নয়। পড়াশুনো শেষ। চাকরি করছে। এখন সে ভালো পরিচালক আর ভালো চরিত্র পেলে কাজ করতে অ-রাজি নয়। বাবা-মাও রাজি হবেন। ছেলের পাওয়া পুরস্কারগুলো (ম্যানিলা ফিলম উৎসবের সেরা পার্শ্ব-অভিনেতা, বি এফ জে এ-র দেওয়া সেরা শিশুশিল্পী, রাজ্য সরকারের একটি পদক, বিভিন্ন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের ছবি) দেখাতে দেখাতে 'ছেলে আবার ফিলম করুক' এই বাসনাটা জাগিয়ে তুলছিলেন যেন মনে মনে।

আর মনে করার চেষ্টা করছিলেন লেক অ্যাভিনিউর বাড়ির ছাদ থেকে সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী 'অপু'কে খুঁজে বার করেন, বোড়ালের শুটিং, প্রথম দিনের শোয়ে সবার কান্নাকাটি করে হল থেকে বেরোন, পড়শীদের উচ্ছ্বাস। সুবীরের মনে পড়ছিল বোড়ালে একদিন একটি বাঁদরের হাতে প্রোডাকশনের সত্যবাবুর চড় খাওয়া। সে তখন মাত্র আট বছরের শিশু। দারুণ মজা হয়েছিল যখন দোনলা বন্দুক বার করে সত্যবাবু তাক করেছিলেন বানরগুলোকে মারার জন্য। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেদিন বানরগুলো নাকি হাতজোড় করে মাফ চেয়েছিল। গুলি আর ছোঁড়া হয়নি।

সেই সদাচঞ্চল সুবীর এখন সত্যিই ফিলম নিয়ে ভাবে, নিয়মিত ছবি দেখে। বাংলা ছবির সাম্প্রতিক দুরবস্থায় সে চিন্তিত। 'অপু'র কিন্তু এরকম চিন্তা থাকার কথা নয়। তবুও সে করে। 'পথের পাঁচালী'র অপুকে চোখে মুখে চেহারায় আজকের সুবীরের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করছিলাম। খুব কমই মিল ছিল। ফেরার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে যে আধফোটা হাসি দিয়ে সে বিদায় দিল আমাকে সেই হাসির মধ্যেই হঠাৎ দেখতে পেলাম যেন 'অপু'কে। জ্বলে উঠল রাংতার মুকুট পরা হাতে বাঁশের তৈরি তলোয়ার নিয়ে 'অপু'। 'বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য'—দুর্ভাগ্য, তা হল না। ★



'অপু' এখন / সুরঞ্জন রায়

'দুর্গা' এখন কোথায়? কী করছেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

'গড়ন পাতলা পাতলা, রঙ অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাঁচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়ছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।'

দুর্গার এই ইমেজটুকু মনে রেখেই আজ থেকে প্রায় আঠাশ বছর আগে সত্যজিৎ রায় খুঁজে পেয়েছিলেন উমা দাশগুপ্তকে। সে তখন বেলতলা গার্লস স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রী। উমার আসল আবিষ্কর্তা অবশ্য আশীষ বর্মণ। ফিলমে অভিনয় করতে দিতে রাজি ছিলেন না উমার বাবা খ্যাতনামা ফুটবলার পল্টু দাশগুপ্ত। কিন্তু 'মানিকদার কাছে না বলবে এমন জোর নেই কারও।'

'পথের পাঁচালী' সব বাধা ডিঙিয়ে তৈরি হল, হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে। তখন কিশোরী উমা সবে ম্যাট্রিক দিয়েছে। এই ছবি যে সারা পৃথিবীতে যুগান্তর আনতে চলেছে সেটা বোঝার ক্ষমতাও তখন তার হয়নি। প্রেস শো'র উত্তেজনা, জওহরলাল নেহরু, মেহেরচাঁদ খান্নার সঙ্গে বসে ছবি দেখার আনন্দেই সে বুঝি তখন মশগুল ছিল।

আজ পঁচিশ বছর বাদে স্মৃতির আলো-আঁধারিতে ঘুরে বেড়াতে খারাপ লাগে না উমা সেনের। তিনি এখন খাঁটি গিন্নী। নাবিক ডি কে সেনের জায়া, দুই সন্তান কোয়েল আর কুণালের মা। দুর্গার চাপল্য আর নেই। দক্ষিণ কলকাতার এক সাজানো ফ্ল্যাটের সর্বাধিনায়িকা তিনি। ঘরে ঢুকলেই



'দুর্গা' এখন

প্রথমে চোখে পড়ে বাঁ দিকের দেওয়ালে দুর্গার একটি হাফ সাইজের ছবি। সামনের সোফায় বসেছিলেন তিনি। চেহারার মিলটা লক্ষ্য করছিলাম। মুখের আদলটা রয়েছে একই রকম, চেহারায় সুখের ছাপ।

বি এ পাশ করার পরই বিয়ে করেছিলেন, তারপর ইকনমিকসে এম এ দিয়েছেন। আর তারপর? এই ঘরকন্না, সময় পেলে গানের চর্চা তো রয়েছেই।

দক্ষিণী থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছিলেন। এখন যুক্ত রয়েছেন ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে, মাঝে মধ্যে গোষ্ঠীর গ্রুপ প্রোগ্রামে অংশও নেন।

সময় কাটে এভাবেই। বিনা নোটিসে আমি যেতেই তিনি বললেন—'এতদিন বাদে তাহলে মনে পড়েছে আমাকে?' ছবি করলে আরও আগেই মনে পড়ত। হাসতে হাসতে উমা সেন উত্তর দিলেন—'একটা ছবি করেই যে সুনাম পেয়েছি, আর কি দরকার? ক'জন এমন পায় বলুন? আপনারা পঁচিশ বছর বাদে আবার আমার কাছে আসছেন—এটাই আমার বড় সম্মান।'

ছোটবেলায় স্কুলের ফাংশানে নাচ-গান-অভিনয় করত কিশোরী উমা। সেই পুঁজিটুকু নিয়েই 'মানিকদা'র কথামত কাজ করেছিল। 'পথের পাঁচালী' কতবার দেখেছেন তার হিসেব নেই। এই তো সূর্যগ্রহণের দিন দুপুরবেলাও একবার দেখলেন। নিজের কাজ কেমন লাগল জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'ভালোই লাগে, অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হয় এখন করতে বললে হয়ত আরো ভালো করতাম। মানিকদা যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন তখন তাই-ই করেছি।'

'পথের পাঁচালী'র পঁচিশ বছর পূর্তিকে তিনি কিভাবে সেলিব্রেট করতে চান জিজ্ঞাসা করায় বললেন—'আলাদা আর কি করব। স্মৃতির-পাতা ঘাঁটতেই এখন আনন্দ।' এখনও উমা সেনের ঘরে সাজানো রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া রবীন্দ্র রচনাবলী, আরও অনেক উপহার। 'পথের পাঁচালী'তে অভিনয় করার পারিশ্রমিক ওগুলো। অতীতের অনেক সুখস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে ওগুলোয়।

বিষণ্ণ দুপুরে হয়ত সেগুলোর দিকে চোখ ফেলে উমা সেন চলে যান কখনও সোনামুখী তলায়, কখনও বা বোড়ালের সেই ভাঙাচোরা বাড়িতে। উদাস হয়ে পড়েন স্মৃতির ভারে। প্রতিদিনের সংসার আর এই সুখস্মৃতি নিয়েই 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা এখন আকাশছোঁয়া বাড়ির ভেতর বন্দী। ★

যে ছবিকে ব্যবসায়ী প্রযোজকরা ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে সরকারী দাক্ষিণ্য দেওয়া কেন?

সৌভাগ্য, সেই আমলা মহোদয়ের কোন উপদেশেই বিধান রায় কর্ণপাত করেননি। মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি তুলে টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই প্রথম এক রাজ্য সরকার ছবির জন্য টাকা খরচ শুরু করলো।

সত্যজিৎ রায় আবার প্রায় আট-ন' মাস বাদে রওনা হলেন বোড়ালের উদ্দেশ্যে। অবশ্য ছবিতেও তখন ছ' বছর পার হয়ে গিয়েছে। দুর্গার চরিত্রে আনা হয়েছে নতুন মেয়ে উমা দাশগুপ্তকে।

এরপর আর বাধা পড়েনি। চুনীবালা-করুণা ব্যানার্জি, কানু ব্যানার্জি, তুলসী চক্রবর্তী, সুবীর-উমাকে নিয়ে প্রায় একটানা শুটিং করে অল্প দিনেই কাজ শেষ। খালি রাতের দৃশ্যগুলোর জন্য স্টুডিওতে সেট ফেলতে হয়েছিল বংশী চন্দ্রগুপ্তকে। আউটডোরের সব কাজই হয়েছে প্রাকৃতিক আলোয়। সেই কনটিনিউটি বজায় রাখতে স্টুডিওতেও ছিল খুব কম আলোর বন্দোবস্ত। তখনকার তাবড় ক্যামেরাম্যানরা সেটের আলোর ব্যবস্থা দেখে মন্তব্য করেছিলেন—'ছোঁড়ারা করছেটা কি: সরকারী টাকার কি অপচয়!'

'পথের পাঁচালী'র প্রথম প্রদর্শনী অবশ্য ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল অনেকের মনে। প্রোজেকশনের গণ্ডগোলেই অরডিনানস হলের দর্শকরা ছবিকে ঝাপসা দেখেছিলেন। সব শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে ছবি যখন মুক্তি পেল তখন সবাই স্তব্ধ, হতবাক!

এ কোন চরিত্রের ছবি! এ জীবন তো আগে পর্দায় দেখান হয়নি! কি দুঃসাহস পরিচালকের যে গ্রামের দারিদ্র্য-দুঃখ নিয়ে এমন একটা বাস্তব ছবি করলেন! ফিলমটা মেক বিলিভের জগৎ, সত্যিকার দৈনন্দিন জীবন কি পর্দায় জায়গা পেতে পারে? তাও এমন নিখুঁত ডিটেলসে! দর্শক-সমালোচক সকলেই এক নতুন স্বাদ পেলেন চোখে: প্রশংসা আর জয়ধ্বনিতে কলকাতা শহর মুখরিত হল।

'পথের পাঁচালী' যখন মাঝপথে বন্ধ, তখন জন হাসটন একবার এসেছিলেন কলকাতায়, তাকে মাত্র দু-তিনটে রীল দেখানো হয়েছিল। তিনি তখনই বলেছিলেন—এ তো এক আশ্চর্য ছবি! শেষ হলে আন্তর্জাতিক উৎসবে পাঠাবার প্রস্তাব তিনিই দেন।

ছবি শেষ হবার পর ইউরোপ থেকে হিতেন চৌধুরী জানিয়েছিলেন পথের পাঁচালীকে 'কান' উৎসবে পাঠাতে। ফরাসীতে সাবটাইটেল করে পাঠান হল ছবি। সত্যজিৎ রায় তখন বেনারসে 'অপরাজিত'র শুটিং করছেন। তার নাকি মৃদু আপত্তি ছিল 'কানে' ছবি পাঠানোয়। সত্যজিৎ চেয়েছিলেন ভেনিস উৎসবে পাঠাতে। ততক্ষণে 'কান' কর্তৃপক্ষ ছবিটি নিয়ে নিয়েছেন।



অবশ্য বহু আগে থেকেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে চিঠি মারফৎ ব্রিটিশ ফিলম ইনসটিটিউটের জেমস কুইন, লিনডসে এনডারসন প্রমুখের যোগাযোগ ছিল। সাংবাদিক এরিক বারনোও তখন 'কানে'। শোনা যায়, 'পথের পাঁচালী' ছবির প্রদর্শনীর সময় ঠিক হয়েছিল ভোরে। হিতেন চৌধুরী এই খবর পেয়ে 'কান' থেকে কলকাতায় ফোন করে পি এস মাথুরকে জানিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র শো-টাইম বদলাতে না পারলে মুশকিল হবে। অত সকালে কে যাবে ভারতের ছবি দেখতে? সবাই তখন ঘুমোবে।

হিতেন চৌধুরীই খবর দিলেন, ড্যাঃ বিধান রায়ের বন্ধু আগা খাঁ এখন 'কানে' উপস্থিত। উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার জানাশুনো ভালো। ডাঃ রায় যদি ওকে অনুরোধ করেন তাহলে কাজ হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নিশুতি রাতে ডাঃ বিধান রায়কে সব কিছু জানালেন মিঃ মাথুর। এবং ডাঃ রায়ও সময় নষ্ট না করে যোগাযোগ করলেন আগা খাঁয়ের সঙ্গে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বন্ধুর শারীরিক খোঁজ খবর নিয়ে আসল কথাটি বললেন। একটু ঘুরিয়ে তিনি বলেছিলেন— 'আমাদের ছবিটা অবশ্যই তুমি দেখবে। আমার লোকজন তোমায় নেমন্তন্ন করতেও যাবে। যদি অসুবিধে হয়, উৎসব কর্তৃপক্ষকে বলো তোমার সুবিধে মত যেন শো-টাইম বদলে দেয়।'

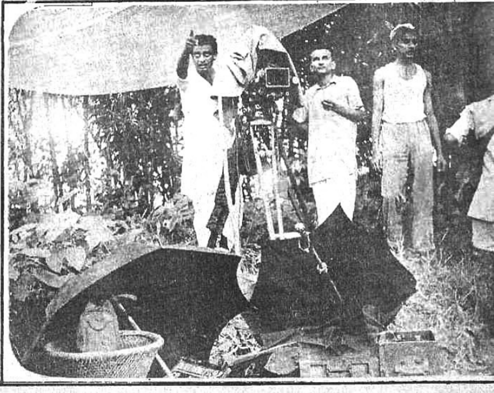
এই কথাতেই বোধ হয় কাজ হয়েছিল। আগা খাঁ শুধু ছবিই দেখেননি, 'কানে' এক বিরাট পারটিও দিয়েছিলেন। জুরীরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভারতীয় জীবনের আসল রূপটি দেখে। 'কান' উৎসবেই উড়লো 'পথের পাঁচালী'র প্রথম জয় পতাকা। শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে এল ছবি। বেসট হিউম্যান ডকুমেনট হিসাবে চিহ্নিত হল তরুণ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। দেশ-বিদেশের নানা উৎসব থেকে আমন্ত্রণের পর আমন্ত্রণ! সর্বত্রই সাড়া পড়ে গেল। প্রায় সব উৎসব থেকেই কোনো না কোনো পুরস্কার নিয়ে এসেছিল 'পথের পাঁচালী'। ভারতের ছবির সামনে খুলে গেল আন্তর্জাতিক দরজা। খুলে দিলেন এক নবীন পরিচালক সত্যজিৎ রায় তার প্রথম ছবি দিয়েই।

অথচ নিজের শহর কলকাতায় তেমন যেন সাড়া নেই। সমালোচকরা প্রশংসা করলেন, দর্শকরা খুশী হলেন। পুরস্কারের পাহাড় জমল পরিচালকের ঘরে। আর কিছু তেমন তো হল না! দু' মাস বাদে মৃণাল সেনের প্রথম ছবি 'রাতভোর' রিলিজ হল। নিখাদ তৃতীয় শ্রেণীর ছবি। এখন শুনেছি মৃণালবাবু এ ছবির 'পিতৃত্ব' অস্বীকার করেন। সারাটা ছাপ্পান্ন সালে অসিত সেনের 'চলাচল', শম্ভু মিত্রের 'একদিন রাত্রে' ছাড়া মনে রাখার মত একটা ছবিও পাওয়া যায়নি, যাকে পথের পাঁচালীর যথার্থ উত্তরাধিকার বলতে পারি। ব্যতিক্রম শুধু সত্যজিতের 'অপরাজিত'।

পরের বছর অবশ্য হাওয়া বদল হল কিছু। অল্প বাজেটে, তারকা না নিয়ে ছবি শুরু করলেন রাজেন তরফদার, ঋত্বিক ঘটক। পেলাম 'অন্তরীক্ষ', তৈরি হল 'অযান্ত্রিক'। বাংলা ছবির পালে লাগল দক্ষিণা হাওয়া। পরিচালকদের ক্যামেরায় ধরা দিতে লাগল 'জীবন' নামে কোন নাটক নয়, খাঁটি জীবনই। 'হেডমাস্টার' (অগ্রগামী), 'গঙ্গা' (রাজেন তরফদার), 'ক্ষণিকের অতিথি', 'কাবুলিওয়ালা' (তপন সিংহ), 'বাইশে শ্রাবণ' (মৃণাল সেন), 'মেঘে ঢাকা তারা'র (ঋত্বিক ঘটক) আলোর ছটায় বাংলা ছবির আকাশ ঝলমল!

সত্যজিৎ হলেন নব্যধারার ছবির ভগীরথ। শুধু বাংলায় নয়, হিন্দিতেও সমাজসচেতন ছবি করার প্রচেষ্টা হল জোরদার। আই-পি-টি-এ'র ছোঁয়ায় বোমবের ছবির জগতে তখন দেশাত্মবোধের ঢেউ উঠেছে। সেখানেও তৈরি হতে শুরু করল 'জগতে রহো', 'দো আঁখে বারহ হাত', 'মাদার ইনডিয়া'র মত সচেতন ছবি।

এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের ঘটনাটি হচ্ছে টালিগঞ্জের সিনেমা ব্যবসায়ী মহলে কিন্তু কোন আলোড়ন নেই! তারা একই গতিতে এবং চিন্তায় ফরমুলার বাঁধা গতেই চললেন। এইসব উদামী, বুদ্ধিমান, জীবননিষ্ঠ পরিচালকদের 'আঁতেল' 'চ্যাংড়া' নাম দিয়ে আমল দিতে চাইলেন না। কিন্তু ব্যাপারটা ধীরে ধীরে গভীরে নামতে শুরু করল। 'পথের পাঁচালী'র বীজ তখন শেকড় ছড়িয়ে চলেছে


বংশী চন্দ্রগুপ্ত

টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায়।

যদিও সত্যজিৎ - মৃণাল - ঋত্বিক-তপন-রাজেন প্রমুখরা কেউই কখনও একজোট হয়ে কোন সিনেমা আন্দোলনের পরিকল্পনা নেননি কিন্তু 'পথের পাঁচালী'ই যে এদের অনেকেরই নীরব প্রেরণা সেটা অস্বীকার করা যায় না। ফরমুলার বাইরে যাবার প্রবণতা এলো ঐ সময় থেকেই। এক ঝাঁক তরুণ নব্য সিনেমার পথ অনুসরণ করলেও এদের অনেকের ছবিই আর্থিক আনুকূল্য লাভ করল না। ব্যবসায়ীরা মনে মনে হাসলেন বটে, কিন্তু ততদিনে ফিলমের নতুন চেহারা ধরা পড়ছে অনেক অ-নে-ক পরিচালকের কাছেই। এই শিল্পমাধ্যমটির গুরুত্ব ও শক্তি যে কতখানি তা আর অবোধ্য নেই।

সেদিক থেকে 'পথের পাঁচালী' আনল যুগান্তর। সত্যজিতের পরবর্তী ছবিগুলোর একের পর এক। আন্তর্জাতিক সাফল্য ও স্বীকৃতি তাকে এনে দিল জগৎজোড়া খ্যাতি। তাকে ছোঁয়ার মত ব্যক্তিত্ব আশেপাশে তখন একটিও নেই। ব্রিটিশ সমালোচক যথার্থ-ভাবেই তাই মন্তব্য করেছিলেন—'Until someone else comes along to change it, Satyajit Roy's Bengal will be cinema's India'.

তার পরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। সারা দেশে বাস্তব, জীবনমুখী ছবি করার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একমাত্র পীঠস্থান হয়ে উঠল কলকাতা।

তবুও পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা নিয়ে বলতে হচ্ছে বাংলা ছবি 'পথের পাঁচালীর' পর যে দুর্বার গতি ও বলিষ্ঠ চেতনা নিয়ে সামগ্রিক আন্দোলন তৈরি করতে পারতো : তা কিন্তু হল না। পথ বিভ্রম ঘটল। ষাটের দশকে যদিও বা কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখা গিয়েছিল, সত্তর দশকের শেষে এসে এখন আবার টালিগঞ্জ তিরিশ দশকের পথে পা রেখেছে। সত্যজিৎকে এখন সশ্রদ্ধ নমস্কারে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তারা উপলব্ধি করেছেন সত্যজিৎকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু শিল্প ইনডাস্ট্রিকে তার ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখতে হবে। নইলে সহজ মুনাফা-শিকারীদের বড় বিপদ!

নিছক বেনিয়াবৃত্তির রমরমে বাজার এখন তাই কলকাতায়। এবং এখনই দরকার আরেকটা 'পথের পাঁচালী'র। মেরুদণ্ড সোজা রেখে, দৃপ্ত ভঙ্গিতে, হাতের মুঠো শক্ত করে আরেক 'পথের পাঁচালী'র জন্ম দেবেন কে?

পঁচিশ বছর বাদে আবার কি সত্যজিৎ রায়কেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে? ভগীরথ কতবার গঙ্গাকে আর মর্তে আনবেন? অনাগত ভবিষ্যতের শূন্যতায় এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া আজকের দর্শকের করণীয় কিছু নেই। ★

আমার স্বামী মোসতাক মুরশেদ

পরিবার চারজনের। তবু আমাদের ব্রেকফাসট টেবিলের সামনে পাঁচটি চেয়ার থাকে। অতিরিক্ত চেয়ারটি বাড়ির পোষা কুকুরের। ঐ তিব্বতী গেসটকে না নিয়ে আমার স্বামী বসতেই চান না।

সৈয়দ কমবর আলি মারঘুবুল জমিল মোসতাক মুরশেদ। আমার স্বামীর পুরো নাম। বংশ পরিচয়ও বিরাট। বলতে পারেন, বরন ইন সিভিল সারভেনটস এ্যানড লইয়ারস ফ্যামিলি। ঠাকুরদা ছিলেন জেলা-শাসক। বাবা আই এ এস। মা নামী সমাজসেবী। বাবার মামা বিখ্যাত ফজলুল হক। কাকারা পাকিস্তানে প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রদূত।

মুরশেদের জন্ম তেত্রিশ সালের জানুয়ারিতে। কলকাতাতেই মানুষ। সেনট জেভিয়ারস কলেজের গ্র্যাজুয়েট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়েন। প্রথম দুটি পরীক্ষায় ফারসট ক্লাস। শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। কেন? ওর বাবা একদিন ডেকে বলেন, তুমি সিভিল সারভিসে যোগ দাও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরীক্ষায় বসতে হয়। কম সময়ের প্রিপারেশনেও আই এ এস। বয়স মাত্র বাইশ। পরে কি বলেছে জানেন? 'আই এ এস হওয়া দুর্ভাগ্য।'

আইনের দিকে ঝোঁকটা বৃথা যায়নি। সরকারি কাজকর্মে আইনের জটিল মারপ্যাঁচ বুঝতে ওঁর কোন অসুবিধাই হয়নি। ৬৭ সালে ট্রাম কোমপানি অধিগ্রহণের ঘটনা মনে পড়ে? ও সে সময় পরিবহণ দফতরের ডেপুটি সেকরেটারি। ও আইনের ফাঁক বের করে। রাজ্য সরকারকে এক কানাকড়িও ক্ষতিপূরণ দিতে হয়নি।

মুরশেদ মেথডিক্যাল। ওর কাছে বাড়ি আর অফিস জীবনের দুটি সেপারেট কমপারট-মেনট। ফাইলপত্র কখনো ফ্ল্যাটে আনে না। বলে, 'অনেকে কাপতানি দেখাতে গাড়ি ভর্তি করে আনে বটে। কিন্তু অফিসে যা সময় তাতে কাজকর্ম সেরেও আড্ডা দেওয়া যায়।'

ব্যক্তিগত জীবনেও রুটিনমাফিক। প্রতি-দিন সকাল আটটায় ঘুম ভাঙে। নিজের হাতে বানিয়ে কফি খায়। এরপর ব্রেক-ফাসট টেবিল…অফিস…।

এমন দিনও গিয়েছে, ওর দেখাই পেতাম না। জানেন, মুরশেদ যখন স্বরাষ্ট্র দফতরে, ছেলে বাবাকে চিনত না। চিনবে কি করে? ও সকাল আটটায় বেরিয়ে যেতো, ফিরতো রাত সাড়ে আটটার পর। বাচ্চা তখন ঘুমিয়ে। শুধু ছুটির দিনে দেখে ধারণা হতো, বাইরের কেউ হবে।

তবে অফিসের কাজে ক্রাইসিস না থাকলে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ঘরে ফেরে। বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। চুপচাপ। গান শোনে। ওয়েসটারন ক্লাসিকাল, উরদু গজল, কাওয়ালি পছন্দ। আমার পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকরড বাজায়। চলে গভীর রাত অবধি।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত গায়কদের কাউকে চেনে না। একবার পার্টিতে সুন্দর চেহারার এক নামী শিল্পীর সংগে ও গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পর শিল্পী বললেন, এবার উঠি। ও জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন? শিল্পী জবাব দিলেন, গাইতে। অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করলো, আপনি গাইতেও পারেন। আসলে মুরশেদ ওঁকে ফিল্মস্টার ভেবে কথা বলছিল।

ওর পারিবারিক ভাষা উরদু। বাঙলা, ইংরেজি, হিন্দি ছাড়াও ল্যাটিন, ফ্রেনচ জানে। বিদেশী পত্র পত্রিকা পড়ে বেশি। দেশের ম্যাগাজিন কম।



শ্বশুরমশাই সৈয়দ মনসুর মুরশেদ। অর্থাৎ এস এম মুরশেদ, আই এ এস। আমার স্বামীর নামও হুবহু তাই। ও কি করে জানেন? বাবার ভিজিটিং কারডও নিজের কাজে চালায়।' আমাদের ছেলে মেয়ের এরও সংক্ষিপ্ত নাম বাবা ঠাকুরদার মতো। মেয়ে সাইকা। দুজনেই ইসকুলে পড়ে। আমার কথায় ওদের বাবা মাঝেমধ্যে পড়াতে বসে। ছেলে বলে, ড্যাডি কানট একসপ্লেন। তখন ও আমাকে বোঝায়; আমি ছেলে মেয়েকে বুঝিয়ে দিই।

বাচ্চাদের বোঝানোর মতো ওর ধৈর্য নেই। লেভেল অব ইনটেলিজেনস না থাকলে বোঝাতে পারে না। সোসাল লাইফেও তাই। অনেক সময় ও বলে, 'এত সহজ ব্যাপার না বোঝার কী আছে?' সবাই যে ওর মতো নয়, সেটা ও বুঝতে পারে না। মোদ্দা কথা, 'হি ইজ ইমপেশেনট উইথ দি লেস ইনটেলিজেনট।'

অফিসেও সেরকম নিশ্চয়। সেজন্য ওকে কেউ কেউ এ্যাগ্রেসিভ, রুড, এ্যারোগেনট বলে। মুরশেদ যে এ্যাগ্রেসিভ এটা ঠিক। নিজেও স্বীকার করে। ও সবকিছু স্ট্রেট লাইনে করতে চায়। কমপ্রোমাইজ করে না। যা ভাবে মুখের উপরই বলে। সব সময় ফাইট করার প্রবণতা। অনেকে এজন্য এ্যারোগেনট ভাবে।

কেউ কায়দা করে কথা বললেই দেখি রেগে উঠে। ওর থিয়োরি কি জানেন? 'কেউ এক ডিগ্রি ভদ্রতা করলে দশ ডিগ্রি ভদ্রতা কর আর এক ডিগ্রি অশোভন হলে দশ ডিগ্রি অশোভন হও।' গায়ে পড়ে ঝগড়া করে না। প্রভোকেটিভ কথা থাকলে আসরে নেমে পড়ে। ওর চেয়ে উঁচু পদের লোকদের সঙ্গেই লড়াই করতে ভালোবাসে। অধস্তনদের দোষ নিজের কাঁধে নেয়।

বিদ্যুৎ দফতর নিয়ে এত কাণ্ড সেসব তো আপনারাও জানেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে বলেই বোধহয় রাতে একদিনও ঘুম হারায়নি। আমাকে সব ঘটনা বলে বইকি। ও দুঃখিত নয়। নিজের পদ্ধতিতে ও যুদ্ধ করে। কারণ থাকলে মুরশেদ রণং দেহি ভূমিকা নেয়, নিজে যুদ্ধ সৃষ্টি করে না। ঠিক করেছে কি ভুল করেছে বিচার করে না।

আপাত ফলই শেষ নয়। আসল জয় মানসিক তৃপ্তিতে। ওর কাছে জুনিয়র ক্লারক থেকে জয়েনট সেক্রেটারি পর্যন্ত অনেকেই আপদে বিপদে ছুটে আসে, পরামর্শ নেয়। এর চেয়ে বড় পাওয়া কি হতে পারে?

মানুষটাকে দেখছি উনিশ বছর। ওর বোন আমার বন্ধু। সে সূত্রেই আলাপ। আমি মজুমদার। ও মুসলমান। ওর বাড়ি থেকে আপত্তি ওঠায় ৬৪ সালে স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাকটে বিয়ে। কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল? ও বলে, 'তুমি'। ডাহা মিথ্যে। নিজের হারটকেই জিগ্যেস করুক।

পৃথক ধর্ম আমাদের জীবনে বাধা সৃষ্টি করেনি। ঠিকই করেছিলাম, কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না। এমন কি হয়েছে জানেন? আমি নন প্র্যাকটিসিং হিন্দু। আর ও ফাংশোনিং মুসলমান। মুরশেদ রোজা করে। ময়দানে নামাজ পড়ে। বলে, 'আমি সৈয়দ। ডাইরেকট প্রফেট ফ্যামিলি। কনভারটেড মুসলমান নই।' নামাজ পড়ার সময় সাধারণ মানুষের লাইনে বসে। সামনের সারিতে যায় না। অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে কখনো আঘাত দেয় না।

আইডিয়াল হলিডে'তে কী করে? বলতে পারেন, ডুয়িং নাথিং। বিছানায় শুয়ে কাটায়। বিদেশে আমি গিয়েছি, মুরশেদও। একসঙ্গে কখনো নয়। অফিসের কাজে সারা দেশে এত ঘুরেছে যে প্ল্যান করে ট্যুর করতে ওর মন চায় না।

আমি সোনা মুরশেদ। কলকাতার লেডি ব্রেবোরন কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রধান। ব্যক্তিত্বের সংঘাত? অনেক পরিবারে হয় শুনি। আমাদের ক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আলাদা। হবে কেন?

মানুষটা কেমন জানেন? ও তখন কাঁথির এস ডি ও। সবে চাকরিতে ঢুকেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সফরে গিয়েছেন। হঠাৎ ধানখেত দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি হে ছেলে, এটা কী? মুরশেদের সপাট জবাব: 'স্পেশাল কাইনড অব গ্রাস্ স্যার।'

ওর কী কী গুণ? আমার কাছে মূলত তিনটি: জেনারাস টু ফলট, জেনারেসলি আউটস্পোকেন স্ট্রেট ফরোয়ারড। দোষও আছে। অধৈর্য আর অগোছালো।

মুরশেদ খেতে ভালবাসে। খাওয়াতেও। ভালো রান্না জানে। মা, দিদির দেখে শিখেছে। দিল্লিতে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ওর কাছে বিরিয়ানি, কোরমা রান্না শিখতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, সময় কোথায়? ওর হবি ছবি তোলা। পোট্রেটের দিকেই ঝোঁক।

অফিসে সংকটের সময় ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে। ভেঙে পড়ে না। গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তবে রাজনীতি করলে ব্যর্থ হতো। হিপোক্রেসি নেই যে।

সাধারণ কর্মীদের কাছে ও প্রিয়। এখনো অনেকে দেখা করতে আসে। ও যেখানে কাজ করে শ্রদ্ধা কুড়োয়। কেউ ভয় পায় না। টিম স্পিরিট আছে। কাজে হস্তক্ষেপ করে না। অন্যে না পারলে নিজে এগিয়ে যায়। কাজে এক চুল ফাঁকিও দেয় না। কতদিন এমন হয়েছে, কোন গণ্ডগোলের খবর পেয়ে গভীর রাতে ছুটেছে সি ই এস সি কনট্রোল রুমে, জেগেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

খোশামোদ করতে জানে না। অন্তত বার ছয়েক ওকে বদলি করা হয়েছে। এতে কিছু মনে করি না। অনেকেই ওর সোজা-সুজি কথা বলাটাকে দেখে। ও কি কখনো অধস্তন কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? কিংবা ধরুন, রাজ্যের প্রকল্প মঞ্জুরির জন্য দিল্লির সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি করেছে। এটা কি ভুল?

ওর প্রচুর বন্ধু আছে। কেউ রেসটুরেনট চালায়, কারো টেলারিং শপ। উঁচু পদের বলে খাতির নেয় না। পুরোনো কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। বৈঠকী আসরে কী বলে? নাথিং সিরিয়াস। ননসেনস টকস। সিরিয়াস আলোচনা হলেই লজিক্যাল।

ভালো বক্তৃতাও দেয়। একটা ঘটনা বলি। বছর আড়াই আগে নিজের পুরনো ইসকুল সেনট জেভিয়ারসের অনুষ্ঠানে ও বলছিল, কিভাবে দুষ্টুমি করেছে সেসব। ওর কাহিনী শুনে আর বলার ঢঙে ইসকুলের ছেলেরা দারুণ খুশী। বাইরে রাশভারী মুরশেদ ওই পরিবেশে অন্য মানুষ।

ওর একটা চাপা গর্ব আছে। রাইটারসে বাবার পর সে ই পদস্থ মুসলমান অফিসার। এখন আর কেউ নেই। ও খুব ভালো ড্রাফট করতে পারে। বুকচুনট আমলে জ্যোতিবাবুর চিঠির খসড়া যে মুরশেদ করে দিত তা আজ কারো অজানা নয়। আমাকে কেমন চিঠি লিখেছে? হি ইজ নট এ গ্রেট রাইটার। সিমপল, ফাংশনাল এ্যানড টু দি পয়েনট। ওর মধ্যে সেনস অব হিউমারও খুব। মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি এ্যাসেস করতে পারে।

মুরশেদেরও মন খারাপ হয়। কি করে বুঝি? যখন বলে, 'বাঙালী জাত গ্যাছে। কাজ করে কম। একসকিউজ দেয় বেশি। আগের মতো বাঙালীরা আর নেই। ভেরি স্যাড।'

লোক দেখানো কিছু করা ওর পছন্দ নয়। সেজন্য বিবাহবার্ষিকী পালন করি না। কথায় বড়ো দাম। বাচ্চাদের কিছু কিনে দেবে বললে ভোলে না, ঝড় বৃষ্টি হলেও আনে। পোষা ছোট্ট কুকুরকেও গাড়িতে নেয়, বেড়ায়।

সিনেমা হলে যায় বইকি। দিল্লিতে তথ্য মন্ত্রকে থাকার সময় বহু ছবি দেখেছে। আরট ফিলমও। কলকাতায় ভালো সিনেমা থিয়েটার হলে আমরা যাই। নিজে কখনো অভিনয় করেছে? আমার কি মনে হয় জানেন—একদম এ্যাকটিং জানে না। সেজন্যই ওকে ঘিরে এত কথা, বিতর্ক। ★

সাক্ষাৎকার : বিশ্বজিৎ সিংহ

আলোকচিত্র : শৌভিক ভট্টাচার্য

খেলাধুলা

প্রকাশের সামনে পরবর্তী চ্যালেনজ— জাকারতা

শাক্যদেব



ষাট কোটি মানুষের দেশ এই ভারতের কেউ কেউ কখনও কখনও এমন এক একটা কাজ কারবার করে ফেলেন যাতে আমরা বুঝতে পারি পৃথিবীর ক্রীড়ামঞ্চে আমাদেরও কিছু দেবার আছে, আমরাও কিছু দিতে পারি। ক্রিকেট বাদে দলগত খেলায় আমাদের দিনকে দিন ব্যর্থতা এখন হতাশায় রূপ নিয়েছে। অ্যাথলেটিকসের অবস্থাও তথৈবচ। তবে মাস পারটিসিপেশনের খেলা না হলেও বিলিয়ারডসে ভারত কিন্তু পৃথিবীর নাকের ডগায় বহুবার লাঠি ঘুরিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে যে তিন ভারতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন বিলিয়ারডসে— উইলসন জোনস এবং মাইকেল ফেরেরা এবং তৃতীয়জন হলেন প্রকাশ পাড়ুকোন। ব্যাডমিনটনে।

ব্রিটেনের ওয়েমবলিতে অল ইংল্যানড চ্যাম্পিয়ানশিপের আসরটি ছিল সপ্তরতম। ডেনিশ এবং সুইডিশ ওপেন জিতে প্রকাশ যখন মানসিকভাবে অল ইংল্যানডের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখন ওর সঙ্গে আমরাও জানতাম এই টুরনামেনটের ইতিহাসে আর কোনও ভারতীয়ই চ্যাম্পিয়নের শিরোপাটি ছিনিয়ে নিতে পারেননি।

তবে কাছাকাছি গিয়েছিলেন আরও একজন ভারতীয়। তিনিও প্রকাশ। ১৯৪৭-এর অল ইংল্যানডে পাঞ্জাবের প্রকাশ নাথ এবং আরও এক ভারতীয় গবিন্দর মোহন সরকারকে চমকে দিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। খারাপ ভাগ্য আর কাকে বলে। না হলে কি দুজনকে কোয়ারটার ফাইনালে লড়ার জন্য মুখোমুখি হতে হয়? দুজনই ভারতীয় বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে একজনকে সরে দাঁড়াবার জন্য টস হয়। টসে জেতেন প্রকাশ নাথ এবং তরতরিয়ে ফাইনালে উঠে আসেন সেমিফাইনালে ইংল্যানডের নরম্যান র‍্যাড-ফোরডকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে। স্কোর ছিল ১৮-১৪ ও ১৫-২। ফাইনালে প্রকাশ কিন্তু সেই খেলা খেলতে পারলেন না। সুইডেনের কোনি ডোপসনের কাছে হেরে গেলেন ৭-১৫ এবং ১১-১৫ গেমে।

প্রকাশ নাথ যা পারেননি তা পারলেন ২৪ বছরের প্রকাশ পাড়ুকোন। কি ভাবে? প্রথম রাউনড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত একটি গেমও না খুইয়ে। এ কৃতিত্বকে অসাধারণ বললেও হয়ত কিছুই বলা হয় না।

পরপর দু' সপ্তাহে ডেনিস এবং সুইডিশ ওপেন খেলা হয়। তারপরই অল ইংল্যানড। কিন্তু সুইডিশ ওপেন জেতার পর প্রকাশ সময় পেয়েছিলেন ছ'টি দিন যা ওর পক্ষে দারুণ সহায়ক হয়েছিল। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়ে প্রথম রাউনডে প্রকাশ প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন ওয়ালওয়ারকে ১৫-৯ ও ১৫-৩ গেমে। দ্বিতীয় রাউনডেও মালয়েশিয়ার আবু বকর দাঁড়াতেই পারলেন না। এবারও স্ট্রেট সেটে জয়। অতঃপর প্রকাশ মুখোমুখি হলেন হাদিয়ানতোর।

প্রকাশের প্রচণ্ড ফরমের শুরু ওখান থেকেই। প্রথম গেমে হাদিয়ানতো ছিলেন দর্শক। প্রকাশ অবলীলায় জেতেন ১৫-০। পরের গেমে হাদিয়ানতো কিছুটা রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশের অনুকূলে ১৫-১০-এ খেলা শেষ হয়। কোয়ারটার ফাইনালে প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী হন শেন প্রি।

সাধারণত অল ইংল্যানডের কোয়ারটার ফাইনালের খেলাগুলি হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা। কিন্তু শেন প্রিও নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকাশের কাছে হারলেন ৪-১৫ ও ৪-১৫-তে। সেমিফাইনালে ফ্রসট হ্যানসেনকে বেসলাইনে আটকে রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রকাশ জিতলেন ১৫-১০ ও ১৫-১০-এ।

অপরদিক থেকে ডেলফসকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন ইনদোনেশিয়ার ব্যাডমিনটনের প্রধান পুরুষ ও গত দু' বছরের অল ইংল্যানড চ্যাম্পিয়ান লিয়েম সুই কিং। অ্যাটাকিং খেলোয়াড় হিসেবেই কিংয়ের নাম। নেটের কাছে উনি মারাত্মক। প্রকাশের তাই একমাত্র চেষ্টা ছিল কিংকে নেটের কাছে ভিড়তে না দেওয়া এবং একের পর এক র‍্যালি করে কিংকে বে-দম করা। প্রকাশ জানতেন এবং বুঝেছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে র‍্যালি করে গেম জেতা কিংয়ের পক্ষে অসম্ভব, কারণ কিং বর্ষীয়ান। তিরিশ বছরের কিংয়ের দম চব্বিশ বছরের প্রকাশের দমের ভাণ্ডার থেকে কম হতে বাধ্য।

ফাইনাল শুরু হওয়া মাত্র প্রকাশ জ্বলে ওঠেন! প্রথম গেমে মাত্র দুটি সার্ভিসেই প্রকাশ ১০-০ এগিয়ে যান এবং ১৫-৩এ প্রথম গেমটি দখল করেন।

এত অল্প আয়াসে কিংয়ের মতো খেলোয়াড়ের কাছ থেকে প্রথম গেমটি পাওয়ায় নিজের ওপর বিশ্বাস প্রকাশের বহুগুণ বেড়ে যায়। তার কারণও ছিল। এর আগে চার-চারবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রকাশ মুখোমুখি হয়েছিলেন কিংয়ের। কিন্তু কোনোবারই জিততে পারেননি। দ্বিতীয় গেমের শুরুটা থ্রিলিং হয়। এক সময় দুজনই ৪-৪। ঠিক সময়েই প্রকাশ খেলার গতি কমিয়ে আনেন এবং ধীরে ধীরে র‍্যালি করে ১১-৪ লিড নেন। এ সময় কিং সাম্রাজ্য হারানোর ভয়ে মরীয়া হয়ে ওঠেন। ১১-৪ থেকে স্কোর ওঠে ১৩-৭। সেখান থেকে ১৩-১০। কিন্তু তারপর ১৪-১০ এর পরে কিংয়ের ব্যাকহ্যানডে বিদ্যুৎগতির স্ম্যাশ ফেলে প্রকাশ ১৫-১০ এ গেম জিতে চ্যাম্পিয়ানের শিরোপাটি দখল করেন মাত্র আঠাশ মিনিটের মধ্যে।

ওয়েমবলিতে অল ইংল্যানডের বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ পেশাদারি-অপেশাদারদের হারিয়ে প্রকাশ হলেন বেসরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। এই মে মাসে জাকারতায় বসছে সরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের আসর। এখনও তাই প্রকাশকে যারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বলে মানতে রাজি নন তাদের মুখের ওপর জবাবের মতো জবাব ছুঁড়ে মারতে প্রকাশ পারবেন তো? পারবেন তো জাকারতার আসরেও বাজিমাত করতে?

আমাদের আশা এবং বিশ্বাস প্রকাশ তা পারবেন। কারণ হিসেবে বলা যায় প্রকাশের সাম্প্রতিক ফরম এবং প্রচণ্ড সংযমী চরিত্র। ব্যাঙ্গালোরের ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে বলে নয়, প্রকৃত খেলোয়াড়ের মতই প্রকাশ কোনও রকম ক্ষতিকর নেশার দাস নয়। সিগারেট, মদ প্রকাশের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকে। অধ্যবসায় না থাকলে এবং সংযমী না হতে পারলে কোনও খেলাতেই বিশ্বজয় করা যায় না। এসবের সঙ্গে প্রকাশের আছে শারীরিক তীব্রতা বা রিফ্লেকস এবং গতি। আর আছে উপরি হিসেবে মারের ভড়াক। সহজ কথায় আমরা যাকে বলি চুকি. প্রকাশের প্রতিটি মারেই তা স্পষ্ট। বুদ্ধির এই দৌড়েই কিং, ফ্রসট, ডেলফসের মতো বিশ্বের বড় খেলোয়াড়দের প্রকাশ হারিয়েছেন।

ব্যাডমিনটনে একান্তর থেকে আশির জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রকাশের জয়ে আমরা যে শুধু খুশিই হয়েছি তা নয়। আমরা গর্বিতও। রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর দীনতা একা প্রকাশই যেন পুষিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ এটাও প্রমাণ করেছেন, চেষ্টা আর আগ্রহ থাকলে শুধু মাত্র অধ্যবসায় আর মনের জোরেও আপাতদৃষ্টিতে ভারতবাসীর কাছে যা অসাধ্য বলে মনে হয় তা টপকানো যায়। জাকারতার আসরে প্রকাশের মনোবলের সঙ্গে ষাট কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা রইল। প্রকাশ পারবেনই। এ বিশ্বাস শুধু আমাদেরই নয়, প্রকাশের কোচ দীপু ঘোষেরও।

প্রকাশ সাহসী। আর ঈশ্বর তো সাহসীদেরই সঙ্গী হন। ★

মুরশিদাবাদের মুসলিম বিবাহ গীতি

নুরুল হক

বাংলার হাওয়া বাতাসে আছে গান। আর সে গান সাধারণ মানুষের গাওয়া—লোক সঙ্গীত। দিনের শ্রমের ক্লান্তি মুছতে, বারো মাসের তেরো পার্বণে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে যুগ যুগ ধরে গান বেঁধেছেন নাম না জানা গ্রামীণ কবি, সাধারণ মানুষের কণ্ঠে সে সব গান সময় থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সময়ে। হয়েছে চিরকালীন।

গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ভেদে, উৎসব অনুষ্ঠানাদির তাৎপর্যে, এমন কি জেলাওয়ারি বিভাজনে বাংলা লোকসংগীত বহু ধরনের: কথা, সুর, ভাব ও মাধুর্যে অভিনব, বিচিত্র। মুসলিম বিবাহগীতি বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি ধারা, যা আজও স্রোতস্বিনী। আজও মুরশিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমায় সুজাপুর, চড়কা, দফরপুর প্রভৃতি গ্রামে মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ 'বিয়ার গান।' না, শুধু গানই নয়, এ গানের সঙ্গে নাচও জমায় বিয়ের আসর। নাচ ও গান মুসলিম বিয়ের স্ত্রী আচার, অবশ্য দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে পুরুষেরাও আনন্দে মাতেন।

মহরম ও রমজান মাস ছাড়া প্রায় সারা বছরই মুসলিমদের বিয়ে হতে পারে। সাধারণত গরমকালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রাম বাংলায় মুসলিমদের বিয়ের উৎসব বেশি দেখা যায়। বিয়ের কথা চলাকালীনই বিবাহগীতি বা বিয়ার গান সুর ছড়ায়। তারপর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলেই পাড়ার সব মেয়েরা বর কনের আঙ্গিনায় ভিড় করে: শুরু হয় বিয়ে বাড়ির আঙ্গিনা ছাপিয়ে নাচ ও গান। প্রথমে বয়স্কা মেয়েরা শুরু করে, তাদের সঙ্গে যোগ দেয় তরুণী বধূরা, বালিকারাও।

চাঁদনী রাতে হায়!
বাঁশুরিয়া বাঁশের বাঁশি বাজায়॥
মাথা বাঁধবো—খোঁপায় দিব গাঁদা ফুল।
রঙ্গীন শাড়ি পরবো,
গলায় থাকবে হার—কানে দুলবে হীরার দুল॥
বাজাবো না পায়ের মল।
আপনি বাজাবে আছে সে কল—॥
চাঁদনী রাতে হায়—

নাচের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা থাকে। বয়স্কা মেয়েরা কোমরে হাত দিয়ে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারাও অনুরূপ ভঙ্গিমা করে। তরুণী বধূরা জোগায় হাততালি সুর আর ঘুঙুরের ঝুমঝুম। তবে বাচ্চা মেয়েদের কতকগুলি নিজেদের বিশেষ নাচ ও গান আছে ছোটদের মনের মতন করে, যেমন

—তালের গাছে চিলের বাসা
ছুঁড়িয়ে ভাঙবো রে···

ঢোলক বাজে তালে তালে। এমনি করেই শুরু হয় শুভবিবাহের—'শাদী মোবারকের' আনন্দ অনুষ্ঠান। বিয়ের তিন-দিন, পাঁচদিন কিংবা সাতদিন আগে 'পান চিনি' বা কন্যার হাতে লগন বাঁধা হয় বরের পক্ষের লোকেদের দ্বারা। ছোটখাট সামাজিক অনুষ্ঠান হয় তখন। 'পানচিনি' মুসলিম বিয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। কন্যার ঠোঁটে বরপক্ষের কিছু লোক চিনি ছুঁইয়ে দেয়: কিছু পানও সেই সঙ্গে তার সামনে রাখা হয়। এই জন্যই অনুষ্ঠানটির নাম পানচিনি। পান চিনি অনুষ্ঠান পর্বের পর থেকেই শুরু হয় ছেলেমেয়েদের নিজের নিজের বাড়িতে তাদের গায়ে হলুদ মাখা। চোখে মোটা মোটা করে কাজল ও হাতে লোহার জিনিস দেওয়া হয়, যাতে তাদের উপর কোন জিনপরী বা কোন অপদেবতা না ভর করে। তাদের কুনজর কুদৃষ্টির থেকে দূরে রাখার জন্য ঘর থেকেও বার হতে নিষেধ করা হয়। এই সময় তাদের বিভিন্ন গান বা গীতের মাধ্যমে নানান কিছু শিক্ষামূলক উক্তি বোঝানো হয়। সেই সঙ্গে চলে হাস-ঠাট্টা-তামাশাও।

বর ও কনের বাড়িতে গায়ে হলুদ মাখার জন্য যখন কাঁচা হলুদ বাটতে বা পিষতে বসা হয়, তখন গাওয়া হয় হলুদ বাটার গান—

হলদি তুমি কি কি কাজে লাগহে—?
আমি লাগি দুলিনা আরশের গায়ে—।
(দুলিনা=কন্যা)
হলদি তোমার জন্ম কোনখানে হে—:
বাবুর বাগানে হে···

বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় পাত্র পাত্রীকে যার যার বাড়িতে সাজানো চৌকির ওপর বসানো হয়, তাদের পায়েস কিংবা ক্ষীর খেতে দিয়ে শুভকামনা জানানো হয়। আঙিনায় সমবেত মেয়েরা সে সময় গান ধরে:

ভারী ক্ষীর খাও হে
ভারী ভারী ক্ষীর
মায়ের হাতের মিষ্টি
বাপের হাতের সৃষ্টি
বিসমিল্লা বলে খাওরে
ভারী ভারী ক্ষীর···

এই রকম কিছু গানের পরে বাড়ির বয়স্কা কোন মহিলার সঙ্গে গান করে নাচে তরুণী কিশোরীরাও:

তোমার বাবার দুয়ারে
হে রানী
ছোকরা নাচন নাচাবো আমি···

প্রসঙ্গত মুসলিম বিয়েতে বর আসে ভোরে, দিনের আলো থাকতে থাকতে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সন্ধ্যের আগেই বর নববধূকে নিয়ে ঘরে ফেরে।

বিয়েতে আসার আগে ছেলের বাড়িতে ছেলেকে গানের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার সঙ্গে কি কি আছে:

তোমার জারিতে কি কি আছে
তোমার জারিতে কি কি আছে (ধুয়া)···

ছেলের হয়ে উত্তর দেন বয়স্কা মহিলারা:

মায়ের লেগে এক পয়সা
বহিনের লেগে দু-পয়সা
কামিনীর (বধূ) লেগে তাপস মন ভুলানি
মায়ের ডোলা পিছেরে (ডোলা=পালকি)
বহিনের ডোলা মাঝেরে
কামিনীর ডোলা আমার দুল দুল ঘোড়ার আগেরে
মায়ের বেজারে হবে কি? (বেজার=রাগ)
বহিনের বেজারে হবে কি?
কামিনীর বেজারে মহল টলমল করে নাকি?—
উড়ে যাবে তিসির ফুল
ভেঙ্গে যাবে মতিচুর
কামিনীর লেগে
তাপসমন—
—নয় ভঙ্গুর—।

আর কনের বাড়িতে তখন যে গান গাওয়া হয়—

১) বনে যাব—বনফুল খাবো
দেশে ছিটাব আঁটি—
আরে আমার জন্য আনিও হে রাজা
সিঁথার মানান সিঁদুর
সিঁথায় বুলাব নাচ-করবো
দেখবো হে তুমি···

১) মাথায় আছে সজনার দাঁড়ি
পথ ছাড়ো ওহে গোয়ালা নারী
ভাসুর মারবে বারি···
কেমন করছে হামার মুন (মন)
মুনে জলে ধিকি ধিকি আগুন···

রাত গভীর হয়ে আসে। নাচ গানের অনুষ্ঠানের শেষ আসর কাপ বা তামাশা এবং ফেরা বা মাগনের।

কাপ বা তামাশা গান ও নাচ অনেক





আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

সময়ই দর্শক শ্রোতাদের কর্ণমূল রাঙা করে দেয়। অশ্লীল, তবে গানের ভাষায় রয়েছে হেঁয়ালীর আবরণ :

বিজি সাঁধালো কুনঠে লো (স'াধালো = ঢুকলো,
বিহাই খুঁজে আঁজর-পাজর (আঁজর পাজর = আশে পাশে)
বিহান খুঁজে জাঙ্গের ভিতর…

রাত্রির সর্বশেষ অনুষ্ঠান মাগন বা ফেরী গানের। মাগন হলো নাচ গানের শিল্পীদের উপহার বা পয়সা চাওয়ার অনুষ্ঠান। চাওয়া হয় নাচ গানের মাধ্যমেই। কেউ অরাজী হলে নাছোড়বান্দা শিল্পীরা তার নামে গান বেঁধে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। টাকা দিলে তবেই মুক্তি।

বিয়ের দিন খুব ভোর বেলায় পাত্রীকে নিজের হাতে নকসা করা মাটির কলসী নিয়ে পুকুর বা নদীতে জল ভরতে যেতে হয়, সঙ্গে প্রিয় সখীরা। গান :

রাজা হেলিয়ে ডোলিয়ে পানি আনতে যায় রে কালা
হেলিয়ে ডোলিয়ে পানি আনতে যায়
পয়সা পড়ে পায়ে রে কালা
পয়সা পড়ে পায়।

সকালেই আসে বর। সঙ্গে আনন্দ উচ্ছল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। প্রথামত বিবাহ হয়। বিয়ের পর বর কনেকে মুখো-মুখি বসিয়ে বরকে প্রশ্ন করা হয়, চাঁদ দেখছো না সূর্য ? অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হয়, মেয়েকে দেখতে কেমন ? এসময় কিছু ঠাট্টা তামাশাও চলে গানের মাধ্যমে, যা শুনতে অশ্লীল হলেও আসলে মজার হেঁয়ালি :

ভরতে কষ্ট বেশি
ঢুকে গেলে খুশি খুশি
বলতো দেখি কি ?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে সকলেরই মুখচোখ রাঙা। তখনই এর উত্তরটা জানিয়ে দেয় গায়িকারা—উত্তর : হাতের চুড়ি বা বালা।

তারপর আসে বিদায়ের পালা। করুণ সুরে কনের প্রিয় সখীরা গান গায় :

তেলের বাটি হাতে রে
কেন গেলাম নাইতে ঘাটে রে (নাইতে = স্নান করতে)
ছোট রাজার ছেলে
তুলে নিলো নৌকাতে
ছোট রাজার ছেলে রে
হলে হলে চালাও নৌকা মাঝি (হলে = ধীরে)
স্বামীর কাঁদন শুনি রে
বাকসো ভরা শাড়ি রইলো
রইলো গহনা ভরা গরু
হায় হায়
কেন নাইতে গেলাম ঘাটে রে

বর বধূকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দেয়। কনে বাড়ির মেয়েরা কনের সখীরা গান গাইতে গাইতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তাদের, তখন গানের মাধ্যমে বরপক্ষ কনেপক্ষর মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলে :

কনে পক্ষ : খানিক দূরে কামিনীর নিদ ভাঙে
আমার মায়ের যেমন তেমন
আমার বাপের কাঁদন দেখ
বর পক্ষ : তোমার মা বাপের কাঁদন
সবই লিখে রেখেছি পাতাতে হে
রেখেছি পকেটে হে
বধূ : দাদিকে দেখে আসি, দাদির কাছে আছে আমার দুধ খাওয়া বাটি
স্বামী : তোমার না দাদির বাটি পকেটে ভরেছি
সব শোনাবো কাহিনী
কেতাবে পড়ি, কোরাণে পড়ি।

প্যালকি, ডুলি মিলিয়ে যায় দূরে। কন্যা পক্ষের লোকেরা ফিরে আসেন ঘরে। তারপর বর বধূকে নিয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছায়। সেখানে বাসর সাজিয়ে বধূর জা ননদেরা গান :

ঝিলিরে ঝিলি
উত্তর মেঘে বহেরে পানি
কিসের ভয় কর হে রানী
দরজা খোলা—তোমার স্বামী
কেতাব কোরাণ ভিজিল হে রানী
কিসের ভয় কর—শিয়রে তোমার স্বামী। ★

ভ্রম সংশোধন

পরিবর্তন. ১৬ এপরিল সংখ্যায় বহুজাতিক ওষুধ কোমপানি সংক্রান্ত লেখায় একটা মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। ছাপা হয়েছে—''মোট চাহিদার মাত্র শতকরা ৯০ ভাগ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রো-ক্লোরাইড ও ০'০১ ভাগ অ্যানালজিন আসে বিদেশী কোমপানিগুলো থেকে"। আসলে হবে ''শতকরা ১০ ভাগ''… ইত্যাদি। এ ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক।

বিচিত্র সমাধিলিপি

জীবন ভৌমিক

স্যামুয়েল স্মাইল নামে একজন ইংরেজ লেখকের বইয়ের বাজারে খুব চাহিদা ছিল। তবে সুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি কোনওদিনই সম্মান পাননি। তার জন্যে স্মাইল পরোয়াও করেননি। লিখে কিছু টাকা কামানো নিয়ে কথা! বটতলার উপন্যাস লিখেই তিনি অঢেল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর জনৈক বন্ধু স্যামুয়েল স্মাইলের সমাধিস্থলে যে সমাধি-লিপির ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে লেখা ছিল 'এইখানে তিনি শুয়ে আছেন যিনি মানুষ হয়ে জন্মে টাকার বস্তা হয়ে মারা গেলেন।'

সুরসিক মনীষী বারনার্ড শ তার সমাধি-লিপির জন্যে লিখে গিয়েছিলেন 'Who the devil was he !'

পৃথিবীতে এইরকম সব বিচিত্র সমাধি-লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই তাদের সমাধিলিপি নিজেরাই লিখে রেখে যান। তাদের মৃত্যুর পর সেই কথাগুলি তাদের সমাধির স্মৃতিফলকে যথাযথ উৎকীর্ণ করা হয়। আবার অনেকের মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয় বন্ধু পরিজন বা গুণগ্রাহীরা যথাযোগ্য সমাধিলিপির ব্যবস্থা করেন।

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকেই পৃথিবীর নানা দেশে সমাধিলিপির ভাব ও রসের বৈচিত্র আসে।

ক্লাইভ ব্রুক তার সমাধিলিপি একটি কথায় সেরেছিলেন। ব্রুকের সমাধিস্থলে লেখা কথাটি হল 'মাফ করবেন, আমি আর উঠছি না।'

শেকসপীয়রের কালে পথচারীদের সুবিধের জন্যে নতুন নতুন রাস্তা করা হত। ফলে অনেক সমাধিস্থল ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হত। সম্ভবত সেই কারণেই শেকসপীয়রের সমাধি-লিপি ছিল এই রকম 'প্রিয় বন্ধু ! যেসাসের দিব্যি রইল, এখানকার মাটি খুঁড়বেন না।'

পৃথিবীর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সমাধিলিপিটি দেখা যায় ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের সমাধির ওপর। তার স্মৃতিফলকে রয়েছে দুটি মাত্র অক্ষর—'এফ-এন।'

জর্জ ক্যাফম্যান-এর স্বরচিত সমাধিলিপিটি খুব মজার। তার সমাধিফলকে লেখা আছে 'চেঁচাবেননা, আমি কিসসু শুনতে পাচ্ছি না।'

ব্রিটেনের এক বিখ্যাত দন্তচিকিৎসকের মৃত্যুর পর তার সমাধিস্থলের স্মৃতিফলকে খোদাই করা হয়েছিল—'পথিক, এইখানে দাঁত বের করেছেন কি মরেছেন।'

★

লোক সংস্কৃতি চর্চা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমুখী কাজের মতই বুদ্ধিজীবী নির্ভর। যাদের সংস্কৃতি নিয়ে লোক-সংস্কৃতির পাণ্ডিত ও গবেষকরা ব্যস্ত, সেই সাধারণ মানুষদের কাছে এদের চর্চিত অধিবিদ্যার ফসল পৌঁছাতে পারেনি। তা ঘটলে যারা 'মৌন সংস্কৃতির' ধারক ও বাহক তারাও সরব হতেন: তাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, লোকগীত ও লোক-নৃত্য, প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে এই বিদ্বানদের দেওয়া আলোকে তারাও আলোকিত হতেন। স্বাধীনতার বত্রিশ বছরেও সেটা সম্ভব হয়নি। লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিফলন হওয়ার জন্যে কোন সৃজনশীল শিক্ষাগত মানদণ্ডে আজও সঠিকভাবে পৌঁছান যায়নি। লোক সংস্কৃতি সামাজিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ লোকসংস্কৃতিকে আলাদাভাবে দেখবার ঠিক মত অবসর এখনও পাননি। তাই লোকসংস্কৃতি তথাকথিত ইতিহাসবেত্তা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাণ্ডিত, সাংবাদিক তথা অন্যান্য বিষয়ের



লোক সংস্কৃতি চর্চায় লাভ হয় কাদের ?

পশুপতি মাহাতো

বিশেষজ্ঞদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের পর থেকে বহু গবেষক লোক-সংস্কৃতিকে ভারতবিদ্যার অংশ হিসাবে ধরে ভারতের সামগ্রিক ঐক্যের কথা না বলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলো তুলে ধরতে লাগলেন। 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হিসাবে চিহ্নিত করে লোক-সংস্কৃতি চর্চাকে এরা 'কিউরিয়ো হানটিং' করে তোলেন। স্বাধীনতার পরও এই ধারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রবাহিত ছিলো এবং আছে। সামগ্রিক গোষ্ঠী চিন্তার নির্যাস লোক সংস্কৃতি হলেও বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়াপনা শুধুমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রগুলিতেই প্রতিফলিত হতে লাগলো।

বৃহত্তর সংস্কৃতির চাপ ও প্রভাবের পাগলামি প্রতিফলিত হতে লাগলো লোক-সংস্কৃতি চর্চায়। ভারতের প্রবহমান দেশজ ভিন্ন ভিন্ন ধারাগুলিকে 'লোকাচার' বলে চালিয়ে দিয়ে, শহর ও নাগরিক সভ্যতার 'দেশাচার'কে সুমহান ঐতিহ্যবাহী বলে ক্রমাগত প্রচার শুরু হলো। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য আমেরিকান বুদ্ধি-জীবীদের আবিষ্কৃত এই দ্বৈতবাদ বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভীষণ ভাবে অর্থবহ ও অর্থকরী হয়ে উঠলো। ইংরাজি 'ফোকলোর' শব্দটির বাংলা কি হবে, এই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'লোক-যান' শব্দটি ব্যবহার করার পরও কিন্তু বিতর্ক থামেনি। লোক-সংস্কৃতির সংজ্ঞা কি হবে তাই নিয়ে বিতর্ক আজও চলছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় মিশনারী তথা বিভিন্ন ভারততত্ত্ববিদ ভারতীয় ঐতিহ্যকে যে কিউরিয়ো রূপ দেবার চেষ্টা করলেন সেটাই পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা পরস্পরের জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে চর্চা শুরু করলেন। আদিবাসীদের সৌন্দর্যে বিমোহিত রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র 'ওগো সাঁওতালী মেয়ে' নিয়ে রোমানটিক কবিতাই লিখলেন না, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ও সংহত শক্তিরূপে তিনি লোক সংস্কৃতিকে প্রয়োগও করলেন। রেভাঃ লালবিহারী দে, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ শহীদুল্লা ও আবদুল করিম প্রভৃতি চিন্তা-নায়কেরা লোক-সংস্কৃতি চর্চাকে জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় ঐতিহ্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে মনে করে ছিলেন।

তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে একদল শহরকেন্দ্রিক উচ্চজাতির ও শ্রেণীর মানুষ লোক-সংস্কৃতি নিয়ে পুরোদমে চর্চা আরম্ভ করলেন। পরবর্তীকালে এরাই বিভিন্ন এলাকার ও বিচ্ছিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেন। ওরা ভাদুপূজা, বাঁকুড়ার ঘোড়া, ডোকরা শিল্প, গম্ভীরা, বোলান কিংবা বিশেষজ্ঞরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হলেন।

লোক-সংস্কৃতি চর্চা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও প্রভাব বিস্তার করেছিলো। উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে লোক-সংস্কৃতির মধ্যে 'আর্য' 'অনার্য' প্রভৃতি বিতর্কমূলক শব্দগুলির প্রয়োগও হয়েছিল। অধ্যাপক ডি ডি কোশাম্বী পরবর্তীকালে আর্য শব্দটি রূপান্তরিত করেন 'অভিজাত' 'ভদ্র বংশজাত' এবং 'স্বাধীন' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে। জাতীয়তা আন্দোলনে গুরুসদয় দত্তের লোক-নৃত্য পুনর্জাগরণের তৎপরতা হিন্দুয়ানির একটি বিশিষ্ট রূপ। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা চেষ্টা শুরু করলেন তাদের নিজস্ব ভাষা, আদর্শ ও গণ্ডীর মধ্যে লোক-সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য। ধীরে ধীরে কোন সম্প্রদায়ের অবদান কত—এই নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের লড়াই তীব্র আকার ধারণ করলো। আদিবাসী অর্থ হিন্দু আদিবাসী বা বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্মের মানুষদের নিয়ে টানাটানি শুরু হলো এর পর। লোক সংখ্যার গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য হিন্দু-মিশন, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস যেমন চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি সাংস্কৃতিক উপনিবেশের অগ্রণী তাত্ত্বিক ও পণ্ডিতেরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শহরকেন্দ্রিক উচ্চজাতি ও শ্রেণীর সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে-ছিলেন।

লোক সংস্কৃতি ভারত ভূখণ্ডের সভ্যতাকে কতদূর সামগ্রিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার চুলচেরা বিচার না করে 'হিন্দু সমাজের গড়ন' নামে প্রবন্ধ লিখে নির্মলকুমার বসু বিতর্কের সৃষ্টি করলেন। ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবদানই বেশি বলে স্বীকৃত হলে। ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পেশা ও ধর্মের মানুষদের সামাজিক লেনদেনে। নমঃশূদ্র ও মুসলমান প্রভৃতি গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে শ্রীবসু মনে করলেন

ভারতের উদীয়মান জাতীয় ঐক্য পঙ্গু হয়ে গেল।

এবার আসা যাক লোক সংস্কৃতির গবেষণার নাম করে কি ভাবে শহর সংস্কৃতির মানুষেরা বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশের মানুষের সংস্কৃতিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় পিকনিক স্পিরিট নিয়ে ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়াতে ছাত্র-ছাত্রী সহযোগে প্রচুর লোকগীতি সংগ্রহ করেছেন। কলকাতাতে এসে যখন বই লিখতে বসলেন তখন লিখলেন :

আম পাতা চিরি চিরি নোনা পাতা বহে
কাসাই নদী দামোদর লহকে পাইবার হে

আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গী ও গায়কী ঢংকে অস্বীকার করার এই হচ্ছে ফল। ভুল সংগ্রহ ভুল ব্যাখ্যা। কিন্তু আসলে হবে :

আম পাত চিরিচিরি নউকা বনাব হে
কাঁসাই নদী দামুদর ছেলাকে পাইবার লে।

উদাহরণ বাড়াব না। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব প্রভৃতি বহু গবেষক এই ভুল করেছেন। এদের বইগুলো আবার এম এ ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক।

লোক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ প্রতিপত্তি, মর্যাদা ও আর্থিক লাভ লোকসানের দিকটাও ভালভাবে বোঝেন। বেহালাতে অবস্থিত একটি ফোক রিসার্চ ইনসটিটিউটকে কেন্দ্র করে এই টানা পোড়েনের সূত্রপাত। পুরুলিয়ার মাটিতে তথাকথিত 'ছো-উৎসব' প্রতি বৎসর সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী থেকে যে টাকা পেতেন তার হিসাব কেউ জানে না। তবে ঐ উৎসবে যোগদানকারী তোড়াং এর বীণাপানি ক্লাবকে মাত্র ২০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। দশম বিশ্ব নৃ-বিজ্ঞান ও জাতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের পোস্টপ্লেনারী সিমপোজিয়া অফ ফোকলোর ও লিটারারী অ্যানথ্রো-পোলজীর ঘটনা অনেকেই জানেন। কলকাতাতে অনুষ্ঠিত এই সিমপোজিয়ামের পরিচালনার জন্য লোক-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা রাতারাতি দুটো দলে পরিণত হলেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দুটো কমিটিরই সভাপতি ছিলেন। একটি প্রস্তুতি কমিটির তিনজন সম্পাদক ছিলেন। সকলেই ডঃ ভট্টাচার্যের স্নেহধন্য ছাত্র। অন্য একটি প্রস্তুতি কমিটির সংগঠক সম্পাদক অবশ্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের। শেষোক্ত কমিটি নাকি ন্যাশন্যাল কমিটির দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন। ইনডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডরসন এবং বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক ডঃ আসরাফ সিদ্দিকীকে নিয়ে যেন লোফালুফি পড়ে যায় এই সম্মেলনে। ডঃ ডরসনের 'লোক সংস্কৃতি বিভাগ' লোক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের কাছে মক্কা' আর ঢাকা যেন 'আজমের শরীফ'। এই অনুষ্ঠানে কত টাকা খরচ হলো, কী কাজ হলো কেউ জানলো না। মাঝখান থেকে সরকারী অতিথিশালা ক্যানটিনের কিছু টাকার বিল বাকি পড়ে রইলো।

লোক সংস্কৃতি গবেষণার নাম করে 'অ্যাকাডেমী অফ ফোকলোর', 'রিসার্চ ইনসটিটিউট অফ ফোক কালচার' রাঢ় পরিকল্পনা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, উইলিয়াম কেরী রিসার্চ ইনসটিটিউট প্রভৃতি অসংখ্য সংস্থা কলকাতা শহরে আজ অবস্থান করছে। তার মধ্যে কেউবা নিজের বাড়িতে সাইনবোরড ঝুলিয়ে ডাইরেকটারের স্ট্যাম্প ব্রীফকেসে রেখে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। হাতে গোনা কয়েকটি লোক, পরস্পরের পিঠ চাপড়ানোর জন্য শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সেমিনার ও বক্তৃতায় যোগদান করেছেন।

তাম্রলিপ্ত সংস্কৃতি পরিষদ, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ, ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি গবেষণা কেন্দ্রগুলি স্থানীয় শহরকে কেন্দ্র করে দেশজ তরুণ ও প্রবীণ গবেষকদের সাহায্যে সীমিত সাধ্যের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতি চর্চা করে চলেছেন। স্থানীয় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য হাজিরও করেছেন। 'অ্যাকাডেমী অফ ফোকলোর' কলকাতা থেকে পুরুলিয়াতে গিয়ে যে ছো-নৃত্য উৎসব সংগঠিত করেছিলেন তা প্রশংসার যোগ্য। জামশেদপুরের 'শিলালিপি', উত্তর বঙ্গের 'মধুপর্ণী', রঘুনাথপুরের 'শিখরভূমি', পুরুলিয়ার 'ছত্রাক', কলকাতার 'ভূমিলক্ষ্মী' ও 'ফোকলোর' পত্রিকা সামগ্রিক ভাবে লোক-শিক্ষার বাহক হিসাবে কাজ করছে।

গত ২৩.৮.৭৯ তারিখে [১১২৩৯ (৭১) তথ্য] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহ সচিব শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় জনৈক বিশেষজ্ঞকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে মনে হয় লোক সংস্কৃতি চর্চার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার যেন সত্যিই আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশংসা-যোগ্য।

লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটা শিক্ষা-গত শৃঙ্খলার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে একটি স্থায়ী রাজ্য সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য লোক-সংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদও গঠিত হয়েছে। এই উপদেষ্টা পরিষদ একটি প্রতিবেদন তৈরি করে রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠাবেন। প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের অভিমতও চাওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত চাইতে গেলে যে প্রতিবেদনের খসড়া রিপোর্ট সঙ্গে পাঠাতে হয় এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সভার কার্যাবলীর বিবরণও পাঠাতে হয় সেটা কিন্তু তারা করলেন না। অর্থাৎ লোক সংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদে কারা আছেন এবং কেনই বা তারা প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত চেয়েছেন তা কিন্তু এখনও অজানা।

ঝাড়গ্রামের 'ছো' নাচ যিনি 'আবিষ্কার' করেছিলেন সেই লোক সংস্কৃতির প্রভাবশালী ব্যক্তিটি বড় ঘনঘন রঙ পালটান। তার সুপারিশে ও অপসংস্কৃতি রোধের এক প্রধান ব্যক্তির সহায়তায় এবার নাকি পশ্চিমবাংলাতে লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হবে। খুবই ভাল কথা। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোক ও গোষ্ঠিকে 'পাইয়ে দেবার রাজনীতি'এরা ভাল ভাবেই বোঝেন। এবারও কি সেটাই করা হবে? তাহলে সেই প্রশ্ন থেকেই যাবে— লোক-সংস্কৃতি চর্চায় লাভ হয় কাদের? ★



আলোকচিত্র : অশোক সরকার

আর্চিবলড ককস

সন্ধানী

"বিশ্বাস করুন, ইন্দিরা গান্ধীর জন্য তৈরি স্পেশ্যাল কোরটের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে নিউজটা দেখেছি। তার কাজকর্মের কোন ডিটেলস আমার জানা নেই। সুতরাং মন্তব্য কি করে করি বলুন?"

জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধীর 'বাড়াবাড়ি' নিয়ে ভারতে যে বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য জানতে চাইলে আমেরিকার বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব আর্চিবলড ককস এই কথাগুলো বলেন।

আর্চিবলড ছিলেন শতাব্দীর বহু আলোচিত ওয়াটারগেট মামলার বিশেষ বিচারপতি। সম্প্রতি আমেরিকান দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় ইনডিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। ছিলেন মাত্র তিনদিন। এই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ঝড়ের গতিতে রোজ প্রায় তিনটে করে মিটিং করেছেন। একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে ছ'বার। উপায়ান্তর ছিল না। সর্বত্রই প্রশ্ন উঠত—ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী নিয়ে মামলা চলাকালীন তার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, কিংবা সাদা-কালোর নাগরিক অধিকারের ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, অথবা সরকারের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সময় কোনো অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব প্রশ্নেরই জবাব তিনি দিয়েছেন সহাস্যে, যুক্তি দিয়ে। বয়স আটষট্টি হলেও চেহারায় চল্লিশের বেশি কিছুতেই নয়। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুল, চশমাটা অনেক সময়েই নাকের মাঝামাঝি এসে ঝোলে, ককস নীল চোখে তাকান চশমার ফাঁক দিয়ে।

কথা বলার ভঙ্গিতে দৃপ্ত, দৃঢ়ভাব। কিছুটা মাস্টারি কায়দাও আছে। ওয়াটারগেট মামলা শেষ হবার পর এখন আর্চিবলডের কর্মস্থল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে তিনি আইনের অধ্যাপক। বোধহয় সে জন্যই।

তার জন্মও এক আইনজীবী পরিবারে। ১৯৩৭-এ তিনি শ্রমিক আইন নিয়ে পড়াশুনো শেষ করে ব্যবসা শুরু করেন। ভালো বক্তা, নিখুঁত ব্যক্তিত্ব এবং আইনের মারপ্যাঁচে ককস চিরদিনই শক্ত কাজের মানুষ। সুতরাং উন্নতি তার কপাল লিখন। চড়চড় করে একাধিক সরকারী মামলায় জিতে তিনি চলে এলেন প্রথম সারিতে। যুদ্ধের পর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি শুরু করলেন।

কলকাতার অতিথি



ওদেশে বোধহয় আইন ব্যবসার চাইতে অধ্যাপনা করা বেশি সম্মানজনক। তাই বুঝি বারবার তিনি কালো গাউন আর বিচারকের চেয়ার ছেড়ে মাস্টারের চেয়ারে বসেছেন, ছাত্রদের সামনে অতীতের অভিজ্ঞতার ঝুড়ি উপুড় করে দিয়েছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময়ই তিনি নজরে পড়লেন জন কেনেডির। তিনি তখন আমেরিকার এক নম্বর নাগরিক। ডেমোক্রেটিক ক্যান্ডিডেটের প্রচার সচিব হলেন তিনি তখন। আর তারপর থেকেই আর্চিবলডের ওঠার পালা। ১৯৬১-তে তিনি হলেন আমেরিকার সলিসিটর জেনারেল।

১৯৭৩ সালের ২৫ মে তার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় দিন। অ্যাটর্নি জেনারেল এলিয়ট রিচারডসন ঐ দিনই তাকে ওয়াটারগেট মামলার বিশেষ বিচারপতি হিসাবে মনোনীত করেন। 'কেমন লেগেছিল সেদিন' জিজ্ঞাসা করায় বেশ তেজীভাব নিয়েই ককস বললেন—'মনে মনে ভাবছিলাম প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করার কি দরকার আমার? কাজ নেই ওসব ঝামেলায়। সংকোচ-দ্বিধা ছিল। বোধহয় স্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের অবস্থা।'

তারই উৎসাহে শেষ পর্যন্ত হাতে নিয়েছিলেন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর মামলা। শুনানী শুরু হতে তিনি দিনকে দিন আশ্চর্য হতে লাগলেন সরকারী আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের লুকোচুরি খেলা দেখে। টেলিফোনে আড়িপেতে টেপ করে রাখা সব বিবৃতি আদালতের সামনে হাজির করার নোটিস জারী করতেই হল একদিন ককসকে। উপায় ছিল না। সেই আদেশ পাতায় সই করার আগেও কিঞ্চিৎ সংকোচ এসে থমকে দিয়েছিল তার কলম মুহূর্তের জন্য। শেষ পর্যন্ত সই করেছিলেন তিনি।

প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন বললেন 'না আমি টেপ দেবো না',—তখনই ককসকে সেই চরম চিঠিটি পাঠাতে হয়েছিল। যাতে তিনি লিখেছিলেন—'আইন সবার জন্য সমান। প্রেসিডেন্টও দেশের একজন নাগরিক। সুতরাং আইন তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে না। আপনাকে টেপ-গুলো দিতেই হবে...।' অনেক বাকবিতণ্ডা, অনেক তর্কের ঝড় তুলে তারপর মাথা নুইয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট নিকসন এই মধ্যবয়স্ক জেদী লোকটির কাছে। যুক্তিতে তিনি ক্ষুরধার, বাচনে বলিষ্ঠ।

তারপরের ঘটনা ইতিহাস, কারও অজানা নয়। এই ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পরোক্ষ ফল সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে আর্চিবলড বলেছেন—'সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি নেই একথা বলতে পারি না, তবে সবাই এখন খুব সাবধান হয়ে গেছেন।'

সেই সঙ্গে তিনি আমেরিকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশংসাও করলেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধহয় এমন স্বাধীনতা নেই। প্রায় যে কোন সরকারী তথ্য প্রয়োজন মনে করলে যে কোন কাগজ যখন তখন ছাপাতে পারেন, জনমতও তৈরি করতে পারেন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পেছনে ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর ভূমিকা অস্বীকার করতে পারবেন না কেউই। ককস একবাক্যে সে কথা স্বীকারও করলেন।

আর্চিবলড ককস যে শুধু আইনের বই নিয়ে মাথা গুঁজে থাকেন তা নয়, পাকা সংসারীও বটে। সময় পেলেই মাইনের গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে চাষ করেন, কাঠ কাটেন। আর নাতিদের নিয়ে খোশ-গল্প, খেলাধুলোয় মেতে থাকেন। আইনী বংশের ছেলে ককস তার মেয়েকেও আইনবিদ করেছেন। সে এখন লনডনে।

কলকাতা কেমন লাগল প্রশ্ন করতে তার চটপট জবাব: 'পাখির চোখে দেখলাম শহরটাকে মন্তব্য করা কি ঠিক হবে? তবে মানুষগুলো খুবই ইনটারেসটিং।' ★

সংস্কৃতি-সংবাদ

সুধীর চ্যাটার্জী



দেবব্রত সম্বর্ধনা

কিংশুক-এর প্রযোজনায় ২১ মার্চ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে দেবব্রত বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জানালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সংবর্ধনার উত্তরে দেবব্রতর গাওয়া কয়েকটি গান প্রমাণ করল রবীন্দ্রনাথের গান তার জীবনেরও গান। যদিও দেবব্রতকণ্ঠে সেদিন শোনা গেল 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' কিন্তু এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতেই সংবর্ধনার মণিহার পরাতে প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ; অজস্র শ্রোতা একটি প্রবেশপত্র সংগ্রহের আশায় ভিড় জমিয়েছিলেন সদন-গৃহের সামনে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগীত-জগতের অমিয়া ঠাকুর, কনক বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, নীহারবিন্দু সেন, শুভ গুহঠাকুরতা, সন্তোষ সেনগুপ্ত; ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সংবর্ধনার রীতি অনুসারে গুণীজনেরা তাদের বক্তব্য রাখলেন। সন্তোষ সেনগুপ্ত বললেন — সংগীতই দেবব্রতর জীবনে একমাত্র সাধনা। নীহারবিন্দু সেন প্রার্থনা করেন যেন দেবব্রত তার অকারণ নৈরাশ্যকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। তরুণ মজুমদারের প্রশ্ন, আগামীর আগ্রহী রবীন্দ্রসংগীতশ্রোতাকে তার বঞ্চিত করার অধিকার আছে কিনা?

এর উত্তরে দেবব্রত 'এ হার তোমায় পরাই যদি তবেই আমি বাঁচি' স্মরণ করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে মাল্যভূষিত করে বলেন— পঙ্কজ মল্লিকের পর রবীন্দ্র সংগীতকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে 'হি ইজ দ্য সেকেনড হিরো'।

'চলে যায় মরি হায়' এবং 'প্রাঙ্গণে মোর' গান দু'টির মধ্যে হেমন্ত বিকশিত হলেন। আক্ষেপ রয়ে গেল কেন তার কণ্ঠে একটিও অনুষ্ঠান-উপযোগী গান শুনতে পেলাম না। কেন সাধারণ জলসা থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের তফাতটুকু বোঝা গেল না?

সব শেষে দেবব্রত শোনালেন রবীন্দ্রনাথেরই গান। জানিয়ে দিলেন তার কণ্ঠের গম্ভীরতায়, প্রকাশভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের গান এখনো কী আশ্চর্যরূপ ধরে! গানের মাধ্যমে তিনি কখনো বলেন 'গান আমার যায় ভেসে যায় চাস নে ফিরে দে তারে বিদায়', কখনো বা 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে'। সব শেষে গাইলেন 'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে আমায় ডাকলে কেন গো'। যদিও তার কণ্ঠ আজ কিছু ক্লান্ত ও স্তিমিত তবু তার কণ্ঠের দু-একটি মুকুল ঝরলেও রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতারা তাকে, তার গানকে বিদায় দিতে চান না, গান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দেবব্রত বুঝিয়ে দিলেন গানের অনুভূতি তার, জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সবশেষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'ক্লান্তি আমার' গানটি এবং তার ইংরেজি অনুবাদটি গাইলেন দেবব্রত বিশ্বাস।

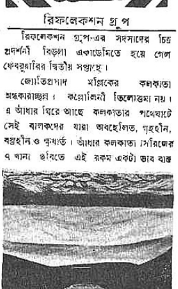
শ্রীনন্দা চৌধুরী

চিত্র-প্রদর্শনী

রিফলেকশন গ্রুপ

রিফলেকশন গ্রুপ-এর সদস্যদের চিত্র প্রদর্শনী বিড়লা একাডেমিতে হয়ে গেল ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে।

জ্যোতিপ্রসাদ মল্লিকের কলকাতা অন্ধকারাচ্ছন্ন; কল্লোলিনী তিলোত্তমা নয়। এ আঁধার ঘিরে আছে কলকাতার পথেঘাটে সেই বালকদের যারা অবহেলিত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত। আঁধারে কলকাতা সিরিজের ৭ খানা ছবিতে এই রকম একটা ভাব ব্যক্ত



মৃত্যুর ডে ড্রিম — আনন্দ রায়

করতে চেষ্টা করেছেন জ্যোতিপ্রসাদ। ব্যবহৃত রঙগুলির মধ্যে আছে হালকা ও গাঢ় সবুজ, গোলাপী ও হলুদ ইত্যাদি।

অজিত দে-র গ্রাফিকস ও মনোজ সরকারের চিত্রগুলির মধ্যে অঙ্কন পারিপাট্য ও রঙ প্রয়োগের সাবলীলতা আছে। এদের অঙ্কনরীতির জটিলতা কখনো ক্লান্তিকর মনে হয় না।

আনন্দ রায়ের সবকটি চিত্রই শিশুবর্ষের প্রশস্তি। কিন্তু আনন্দর শিশুরা বাতাসে শুধু যন্ত্রণার স্বপ্ন বোনে।

উদ্ভট, গতানুগতিক

সংহত কাঠামো, ক্ষেত্রবিভাজনের পরিমিতি ও অনুকূল বর্ণ প্রয়োগরীতি এই তিনটি ব্যাপারে কিছুটা দখল থাকলে যে কোন চিত্রকর মোটামুটি একটা চলনসই চিত্র এঁকে ফেলতে পারে।

রাধাবল্লভ মণ্ডল ও সোমেশ রায়ের [প্রদর্শনী—অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস] চিত্রাঙ্কনের চর্চা নেই বলা যায় না। কিন্তু ছবির বিষয়, প্রয়োগরীতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ধৈর্যের বিলক্ষণ অভাব আছে।

রাধাবল্লভের আঁকা চক্চকে ও প্যাঁচার মত আকৃতির জবুথবু মূর্তিগুলির তাৎপর্য কি? উদ্ভট মূর্তি আঁকার ঝোঁক প্রবল।

সোমেশ রায়ের অভিব্যক্তিবাদের আভাস বিশ্বাসযোগ্য হয়নি এবং আকৃতিগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত নয়। 'অন্ধের যষ্টি' চলনসই।

শিবব্রত রায়ের জলরঙের বিষয় যখন নিসর্গ তখন তিনি সহজ, স্বাভাবিক। সামাজিক বক্তব্য গূঢ় রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করার কৌশল এখনো তার আয়ত্ত হয়নি। কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্র। উইক-এনডের শখের চর্চা—ফাইন আর্টস। মাঝে মধ্যে কিটব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন ছবি আঁকতে। আকর্ষণীয় কিছু চোখে পড়লে আঁকতে শুরু করেন। তেলরঙে মজা পান না। জলরঙ টানে। শিলং সিরিজের তিনটি ছবি ভাল হয়েছে। অবশ্য গতানুগতিক। কলকাতার ময়দানকে ভিত্তি করে কল্পনা ও বাস্তব মিশেল দুটি নিসর্গদৃশ্য দেখা গেল। নীল, সবুজ, হলুদ, কালো, সাদা এ সব রঙ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ক্লাব টেনটের অদূরে মেট্রো রেলের জন্যে ওরা যেখানে কলকাতার হৃদয় খুঁড়ছে শিবব্রত বোধহয় ইচ্ছে করেই সেই ধূলিধূসর দৃশ্যটি এড়িয়ে গেছেন।

ফ্যানটাসি ও আরো কয়েকজন

ফানটাসি গ্রুপ-এর সদস্যদের [চিত্র-প্রদর্শনী — বিড়লা আকাডেমি ১১-২৩ মার্চ] অনেকেই অঙ্কনপটু ছবিগুলি তেলরঙের।

বিজেন্দ্র বৈদ্য প্রত্যেক ছবির খুব গালভরা নাম দিয়েছেন। কীলিং ফ্রেন্ড পড়েছেন, যোগশাস্ত্রের ভাসাভাসা জ্ঞান আছে। সুতরাং শিশ্ন, কমলযোনি, অনঙ্গ, ষট্চক্র, মূলাধার, সহস্রার ইত্যাদির প্রতীক ও রূপ নিয়ে নিশ্চিন্তে ছেলাখেলা করার হক আছে বলতে হবে। রঙ ব্যবহারে আশ্চর্য পরিমিতিবোধ দেখিয়েছেন। কিন্তু, ছবিগুলি দেখে আপনার মনে হবে, 'বড় বিদ্যা করিছে জাহির!

সুনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়-র বিশ্ব রিক্ত ও ঊষর। সেখানে শুধু শীত, হিম হাওয়া।

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর 'অগ্নিশিখা' ও বিষাদ' দুটি ছবিই উল্লেখযোগ্য। বিষাদ চিত্রে দরজার (?) সামনে একটি নারী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ, কাল, ছাই নীল ও সাদা তেলরঙের পুরু প্রলেপে আঁকা ছবিটির বৈশিষ্ট্য দর্শনীয়, কিন্তু বর্ণনার যোগ্য নয়। স্বাতী রায়ের ঢেউ সিরিজের ছবিগুলি চমৎকার। ব্যবহৃত রঙগুলির মধ্যে আছে হলুদ গোলাপী, সবুজ, সাদা ও নীল। স্বাতী সমুদ্রের ঢেউ এঁকেছেন। সমুদ্র থেকে পৃথক করে তিনি নির্বিশেষ ও বিমূর্তরূপে ঢেউকে নিরীক্ষণ করেছেন।

অচিন্ত্য ভট্টাচার্য খুব ঝলমলে রঙে ছবি আঁকেননি। 'গ্রামীণ জীবন' চিত্রে বিভিন্ন বর্ণের ছয়টি অসম ক্ষেত্রে বিভক্ত কাঠামোর মধ্যে একটি গ্রামবধূ কলসী মাথায় নিয়ে চলেছে। 'স্বপ্ন' ছবিটি নীল ও লালচে বেগুনী রঙে আঁকা শায়িতা রমণী। রমণীর সুডৌল প্রায় উপবৃত্তাকার দেহ বিছানায় এলান। স্বপ্ন নয়, ভাব মৈথুন। নারসারি রাইমের ছোট্ট মেয়েরা 'সুগার অ্যানড স্পাইস অ্যানড অল থিংস নাইস' দিয়ে তৈরি কিন্তু অচিন্ত্য কি জানেন না উদ্ভিন্নযৌবনাদের দেহে শুধু ফোম-জাজিম নয়, বক্র ও ঋজু কিছু হাড়গোড় আছে।

প্রণব নাগ

নাট্য-সমীক্ষা

কণ্ঠস্বর

নাটক: গৌতম মুখার্জি। **আলো:** সুশীল দাস। **মঞ্চ:** সুরজিত। **সঙ্গীত:** রবীন পাল। **প্রয়োগ:** নীলাদ্রি দাশগুপ্ত। **অভিনয় রজনী:** ২৫ মার্চ ১৯৮০, যোগেশ মাইম একাডেমী।

বৈষ্ণব-কবিতায় আছে: আমি ঠেকেছি পীরিতের দায়ে আমার যেতেই যে হবে গো। মীনাক্ষীর জীবনে এ কবিতার সার্থক প্রয়োগ। প্রেমিক অরূপের ভালোবাসায় দান শরীরে নিয়ে স্বার্থান্ধ মহাপুরুষ নবপ্রধানের জালে আটকা পড়ল মীনাক্ষী। একদিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে সীমাহীন প্রত্যয়। এরই টানাপোড়েনের ফসল 'কণ্ঠস্বর'।

আলোর অভাবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার অনুষ্ঠান শুরু হল সাতটায়। হায়, সেই অবক্ষয়, শোষণ ইত্যাদির সমন্বয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সেনটিমেনটে সুড়সুড়ি। নাট্যকার রিয়ালিসটিক, সিমবলিক সব কিছুই রেখেছেন।

অতি দুর্বল সংলাপে বারবার হোঁচট খেয়েছেন শিল্পীরা। নবপ্রধান উল্লেখ্য চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও শরক্ষেপণে পরিব্যাপ্তির অভাব ও ফেলে-আসা অভিনয়রীতিকে কাটিয়ে উঠতে না পারায় নীলাদ্রি দাশগুপ্ত সার্থক হতে পারলেন না। মীনাক্ষীর চরিত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি। তবে অবাক লাগে যখন দেখি কুমারী মীনাক্ষীর সিঁথিতে সিঁদুর। চাবিদা চরিত্রে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক উজ্জ্বল। আবহ সঙ্গীতের নামে দুম-দাম আওয়াজ (বোধ হয় বঙ্গোর) বড়ো কানে লাগে। আলোকসম্পাত গতানুগতিক, একই সিচুয়েশনে অনেক রঙের ব্যবহার অর্থহীন। টিমওয়ার্ক নেই বললেই চলে।

প্রীতিময় দে চৌধুরী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক-ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), হইতে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯) হইতে প্রকাশিত

দস্যু মোহন ১

মূল কাহিনী : শশধর দত্ত ◇ চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস





কলকাতার হোটেলে / সৌপক রায় বর্মণ